

চরৈবেতি চরৈবেতি
ফেসবুক ভ্রমণ গ্রুপ

২৫ তম সংখ্যা

জুলাই-২০২৬

চরৈবেতি চরৈবেতি
ফেসবুক ভ্রমণ গ্রুপের নিবেদন

ভ্রাম্যমাণ

ই-পত্রিকা

প্রচ্ছদ

স্বচ্ছশীলা বসু

পোষ্ট বিষ্ণুপুর (Date of Posting – 03.06.2026)

পত্রিকার নামকরণ

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

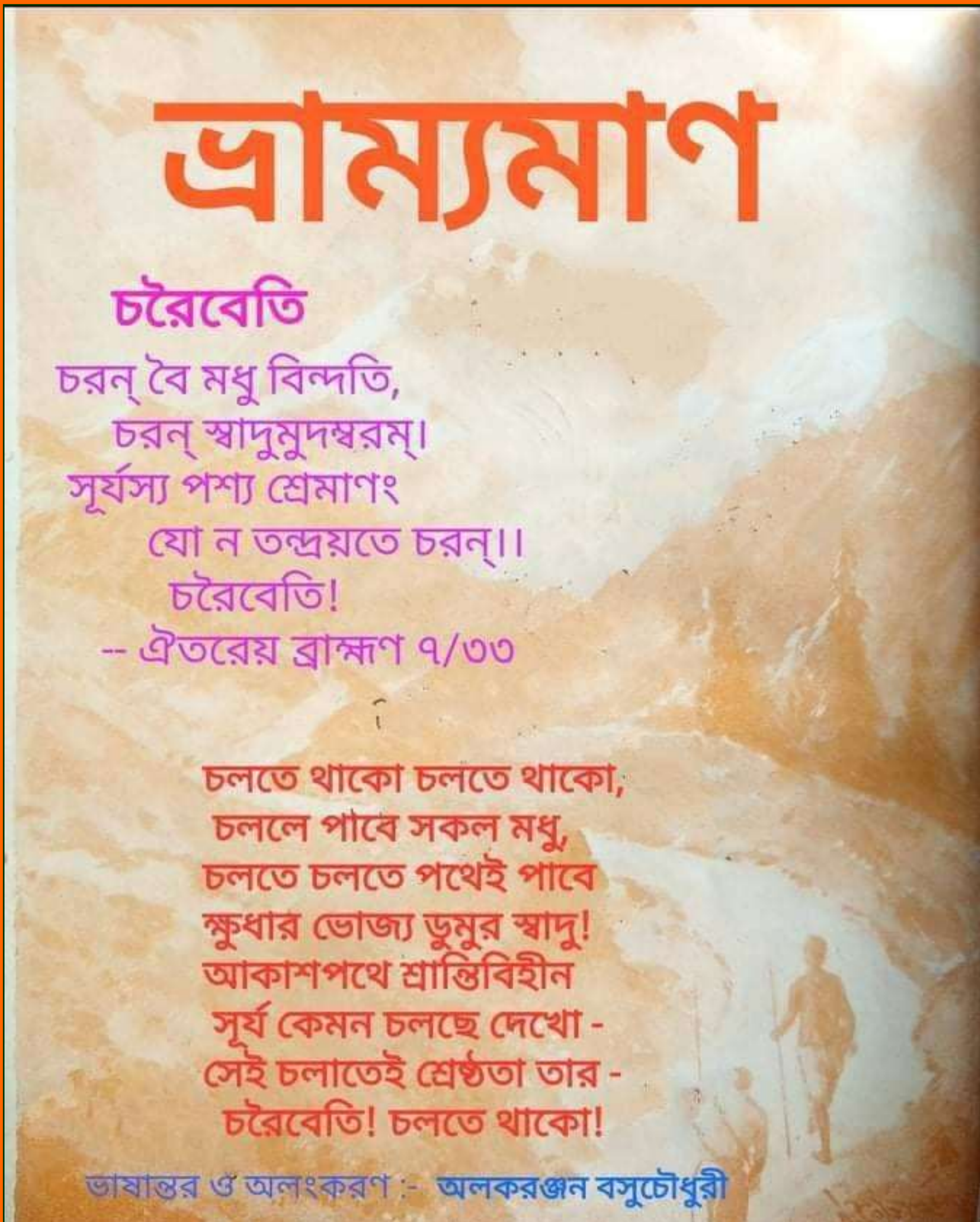
প্রচ্ছদের লোগোতে ব্যাবহার করা ছবি

শিবাংশু দে।

সম্পাদনা – গুঞ্জন গুহ

সংখ্যা – ২৫

জুলাই – ২০২৬


ভ্রাম্যমাণ
চরৈবেতি
চরন্ বৈ মধু বিন্দতি,
চরন্ স্বাদুমুদম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং
যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।।
চরৈবেতি!
-- ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭/৩৩
চলতে থাকো চলতে থাকো,
চললে পাবে সকল মধু,
চলতে চলতে পথেই পাবে
ক্ষুধার ভোজ্য ডুমুর স্বাদু!
আকাশপথে শ্রান্তিবিহীন
সূর্য কেমন চলছে দেখো -
সেই চলাতেই শ্রেষ্ঠতা তার -
চরৈবেতি! চলতে থাকো!
ভাষান্তর ও অলংকরণ :- অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

ভ্রাম্যমান ই-পত্রিকা সম্পর্কে ।

ভ্রাম্যমাণ মাসিক ই-পত্রিকার প্রথম সংখ্যার শুভ সূচনা হয়েছিল **আগস্ট, ২০২১**-এ। আজ প্রকাশিত হচ্ছে এর **২৫তম সংখ্যা**। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে ইতিমধ্যেই **২৪টি সংখ্যা** প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দুই বছরে প্রকাশিত ২৪টি সংখ্যার প্রায় **৬২০০ পৃষ্ঠা জুড়ে** সংকলিত হয়েছে **৭০০-রও বেশি ভ্রমণস্থান** সম্পর্কিত প্রায় **৬,০০০টি রঙিন ছবি** যার মধ্যে রয়েছে **২৭৫ টি দর্শনীয় স্থানের** বিশদ বা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এই সাফল্য একান্তভাবেই আমাদের গ্রুপের সকল সদস্যের সম্মিলিত অবদানের ফল। আপনাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা নিয়মিত এই ই-পত্রিকায় লিখে চলেছেন এবং যাঁরা লেখকদের নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতাই **ভ্রাম্যমাণ**-কে সমৃদ্ধ করেছে।

ই-পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত **'চরৈবেতি'** শ্লোকের একটি অংশের ভাষান্তর ও অলংকরণ করেছেন গ্রুপের প্রারম্ভিক দিনের বরিষ্ঠ সদস্য, শ্রদ্ধেয় **শ্রী অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী**। তাঁর এই মূল্যবান অবদান আজ আমাদের গ্রুপের এক বিশেষ পরিচিতি ও থিম হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

আমাদের এই মাসিক ই-পত্রিকার **'ভ্রাম্যমাণ'** নামটিও তাঁরই প্রস্তাবিত। তাঁর উদ্যোগেই ই-পত্রিকায় সংযোজিত হয়েছে দুটি নতুন বিভাগ— **'ভ্রাম্যমাণের লাইব্রেরি'** এবং **'ভ্রাম্যমাণের কাব্যকুসুম'**। **'ভ্রাম্যমাণের লাইব্রেরি'** বিভাগে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ-সহ প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের ভ্রমণবিষয়ক রচনার নির্বাচিত অংশ, তাঁদের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। অন্যদিকে **'ভ্রাম্যমাণের কাব্যকুসুম'** বিভাগে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানকে কেন্দ্র করে রচিত নির্বাচিত কবিতা, তাঁদের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এ ছাড়া ই-পত্রিকার অন্যান্য বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে— **'রম্যাণি বীক্ষ্য'**, **'ভ্রমণস্থলী- তথ্যকোষ'** এবং **'লেন্সবন্দি'**।

এই ই-পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য হলো ভ্রমণপ্রেমী লেখক, আলোকচিত্রী ও পর্যটকদের অভিজ্ঞতা বৃহত্তর পাঠকমহলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভ্রমণবিষয়ক তথ্য, অভিজ্ঞতা ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে যেমন ভবিষ্যৎ পর্যটকেরা উপকৃত হবেন, তেমনি পর্যটন-উদ্যোগও সমানভাবে লাভবান হবে। এর পাশাপাশি অজানাকে জানার এবং ভালো লাগার এক ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্তরে নিহিত রয়েছে শুধু এইটুকুই।

গ্রুপের সকল সদস্যের কাছে আন্তরিক আবেদন— যাঁরা ভ্রমণবিষয়ক লেখা লিখতে ভালোবাসেন অথবা ভ্রমণের সুন্দর মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে সেই লেখা ও ছবি গ্রুপে পোস্ট করুন। আপনাদের লেখা ও আলোকচিত্রই **ভ্রাম্যমাণ**-এর আগামী সংখ্যাগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে,
গুঞ্জন গুহ

গ্রুপ সম্পর্কে কিছু কথা।

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে মাত্র ১৮ জন সদস্যকে নিয়ে এই ফেসবুক গ্রুপের যাত্রা শুরু। গ্রুপের নাম ছিল **"ভ্রমণ, তথ্য ও ছবি"** ট্র্যাভেল গ্রুপ । পরবর্তীতে গ্রুপের বরিষ্ঠ সদস্য **শ্রী অলোকরঞ্জন বসু**র পরামর্শে গ্রুপের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "চরৈবেতি"। প্রারম্ভিক দিন থেকেই গ্রুপের কভার পেজে শোভা পাচ্ছে গ্রুপের রত্ন এবং বরিষ্ঠ সদস্য শ্রদ্ধেয় **শ্রী শিবাংশু দের** লেন্সবন্দি ছবি।

গ্রুপ গড়ে তোলার **মূল উদ্দেশ্য ছিল যেখানে শুধু ভ্রমণ-ছবিই নয়, সদস্যদের মধ্যে ভ্রমণ-সংক্রান্ত তথ্যের আদান**-প্রদান, পর্যটনস্থানের পরিচয় এবং **ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার একটি ভ্রমণমুখী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা**। গ্রুপের প্রথম দিকের দিনগুলিতে কয়েকজন বিশিষ্ট ও গুণী সদস্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের অসামান্য ভ্রমণ-লেখা, তথ্যবহুল পোস্ট এবং চমৎকার আলোকচিত্র নিয়মিত ভাগ করে নিয়ে এই গ্রুপকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তাঁদের অবদানের ফলেই **ধীরে ধীরে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৫,৭০০-এ পৌঁছায়।**

সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পরে দেখা যায়, গ্রুপে যাঁরা নিয়মিত লেখা ও ছবি পোস্ট করছেন, অধিকাংশ সদস্য তাঁদের উৎসাহিত করতেও অনাগ্রহী। সম্ভবত দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক মাধ্যমের পরিবর্তিত ব্যবহার ও ফেসবুকের জনপ্রিয়তার ধরন বদলে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি। ২০২২ সালের জুন-জুলাই গ্রুপের সদস্যসংখ্যা কমিয়ে ১৫৮ তে আনা হয় ও গ্রুপটিকে Private (Closed) গ্রুপে রূপান্তরিত করা হয়।

ব্যক্তিগত সময়ের অভাব এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন গ্রুপকে যথাযথ সময় দিতে পারিনি। বর্তমানে কিছুটা সুস্থ বোধ করায় নতুন উদ্যমে আবারও এই পথচলা শুরু করেছি। **পুরনো** "চরৈবেতি"**-র আদর্শ ও ধারাবাহিকতাকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে নতুন পাবলিক গ্রুপ "চরৈবেতি চরৈবেতি"- র যাত্রা।**

এই নতুন উদ্যোগকে সফল করার জন্য গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যের কাছে আন্তরিক আবেদন—সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন, **নিজের লেখা ও তোলা ছবি পোস্ট করুন এবং অন্য সদস্য যারা লেখা ও ছবি পোষ্ট করছেন তাদের উৎসাহ দিন**। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে উঠুক এক প্রাণবন্ত গ্রুপ।

গ্রুপের এই দীর্ঘ পথচলায় বিশেষভাবে **কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয়** শ্রী অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী**, শ্রদ্ধেয় শ্রী শিবাংশু দে, শ্রীমতী রুচিস্মিতা ঘোষ, শ্রদ্ধেয় শ্রী সুব্রত ঘোষ ও আরও কিছু সদস্যকে,** যাঁরা তাঁদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই গ্রুপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

গ্রুপের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। **আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণেই "চরৈবেতি চরৈবেতি" আরও সমৃদ্ধ ও সার্থক হয়ে উঠুক—এই আমাদের প্রত্যাশা।**

ধন্যবাদান্তে

গুঞ্জন গুহ ।

সূচিপত্র

ক) ভ্রাম্যমাণের লাইব্রেরি

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রবোধকুমার স্যান্যাল

সংকলক :- গুঞ্জন গুহ



খ) ভ্রাম্যমাণের কাব্যকুসুম

চন্ডালী

কুমুদ রঞ্জন মল্লিক

সংকলক :- গুঞ্জন গুহ

পাতা ৩৬-৪১



গ) রম্যাণি বীক্ষ্য

শিবাংশু দে'র লেখা







সুব্রত ঘোষের লেখা



রুচিস্মিতা ঘোষের লেখা

পাতা ১৩৫ - ১৫২

ফুলের উপত্যকা



পাতা ১৫৩ - ১৫৮

লোদি গার্ডেন



সুস্মিতা বাগচীর লেখা

পাতা ১৫৯ - ১৬৭

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থানঃ পর্ব -১ বড় সোনা মসজিদ।



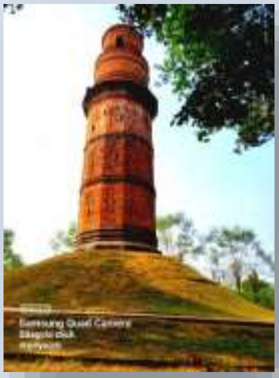
সুস্মিতা বাগচীর লেখা

পাতা ১৬৮ - ১৭৩

মালদা গৌড়ের

দ্রষ্টব্য স্থানঃ পর্ব-২

ফিরোজ মিনার



পাতা ১৭৪ - ১৮১

মালদা গৌড়ের

দ্রষ্টব্য স্থানঃ পর্ব-৩

দাখিল দরওয়াজা



পাতা ১৮২ – ২০০

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য

স্থানঃ পর্ব - ৪

চিকামসজিদ



জয়তী সেনের লেখা







জয়তী সেনের লেখা





ঘ) ভ্রমণস্থলী-তথ্যকোষ

রাজ্য - কর্ণাটকঃ মহীশূর

গুঞ্জন গুহর সংকলন









রাজ্য - কর্ণাটকঃ মহীশূর

গুঞ্জন গুহর সংকলন

রাজ্য - কর্ণাটকঃ মহীশূর

গুঞ্জন গুহর সংকলন



লেন্সবন্দি

সুদীপ কুমার রায়ের ক্যামেরায়

পাতা ৩৩০ - ৩৩৯

Haflong



পাতা ৩৪০ - ৩৫২

Bhutan



রুচিস্মিতা ঘোষের ক্যামেরায়

পাতা ৩৫৩ - ৩৫৫

মহাবলিপুরম



অনন্যা ব্যানার্জির ক্যামেরায়

পাতা ৩৫৬ - ৩৫৭

Pondicherry



পাতা ৩৫৮ - ৩৬২

Sarbamangala Ghat, Cossipore



স্বচ্ছশীলা বসুর ক্যামেরায়

পাতা ৩৬৩ - ৩৬৮

বিষ্ণুপুর



চন্দ্রশেখর দে'র ক্যামেরায়

পাতা ৩৬৯ - ৩৭৩

নুব্রা



পাতা ৩৭৪ - ৩৭৯

প্যাংগং হ্রদ



পাতা ৩৮০ - ৩৮৩

Hemis Monastery



পাতা ৩৮৪ - ৩৮৬

Thang



চন্দ্রশেখর দে’র ক্যামেরায়

পাতা ৩৮৭ - ৩৯২

Turtuk



পাতা ৩৯৩ - ৩৯৮

Lamayuru -
Sangam –
Magnetic Hill -
Gurudwara Pathar Sahib



পাতা ৩৯৯ - ৪০১

Doodhpathri



সুদীপ্ত দত্তের ক্যামেরায়

পাতা ৪০২ - ৪০৩



BLUE SKY
GANGA RIVER

তীর্থঙ্কর প্রামানিকের ক্যামেরায়

পাতা ৪০৪ - ৪০৬

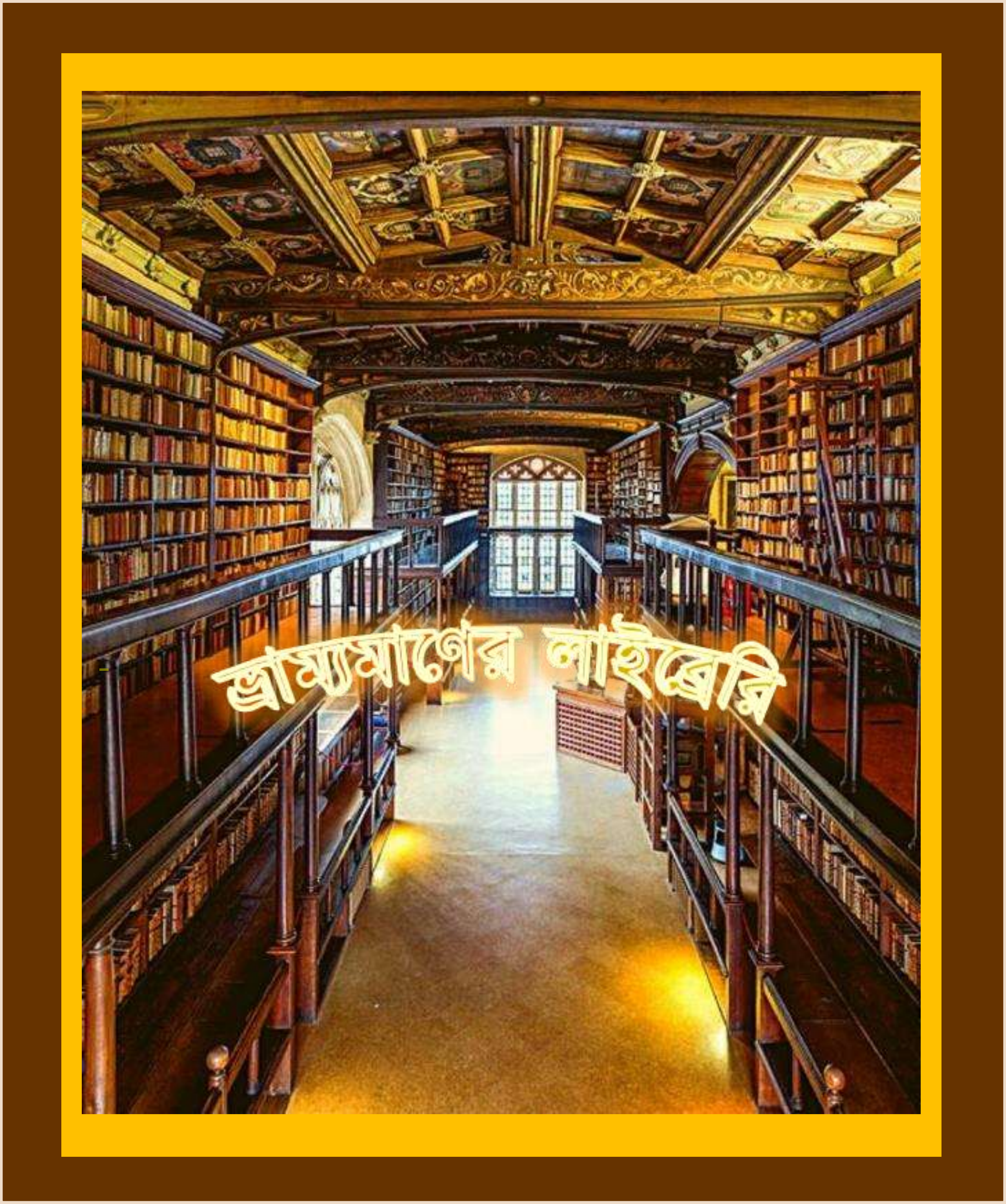


সুন্দরী অরুণাচল

পাতা ৪০৭ - ৪০৯



Tippi Orchid Center, Arunachal


ভ্রাম্যমাণের লাইব্রেরি

'ভ্রাম্যমাণের লাইব্রেরি'

আমাদের এই বিভাগটিতে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ অতীতের নানা লেখকের রচনা থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের নির্বাচিত অংশ পরিবেশন করা হচ্ছে।

জুলাই মাসে শ্রদ্ধেয় লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল-এর জন্মমাস। তাঁর স্মরণে জুলাই মাসের এই সংখ্যায় তাঁর রচনা কালজয়ী ভ্রমণগ্রন্থ 'মহাপ্রস্থানের পথে' থেকে নির্বাচিত একটি অংশ পাঠকদের জন্য সংকলন করে উপস্থাপন করা হলো।

লেখক পরিচিতি

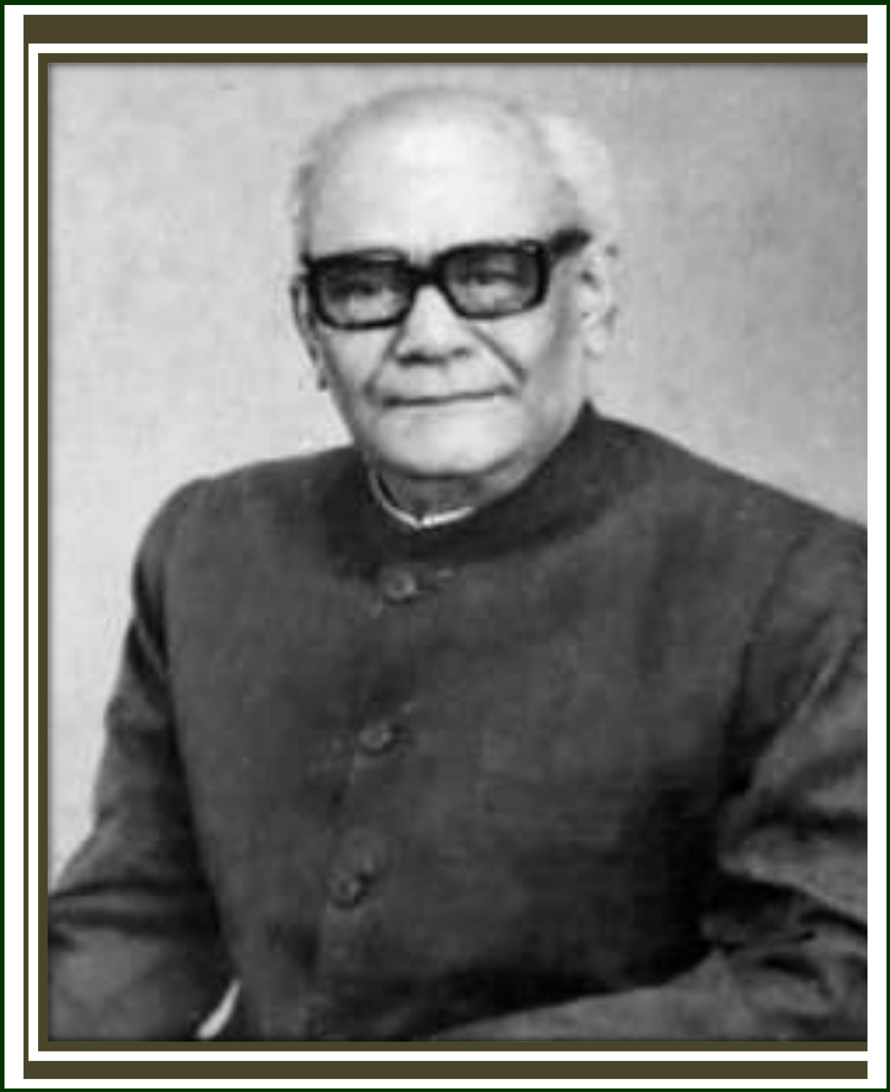
প্রবোধকুমার সান্যাল—সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পরিব্রাজক। ১৯০৫ সালের ৭ জুলাই তাঁর জন্ম। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল 'কীর্তনীয়া'। কল্লোল যুগের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক হিসেবেই প্রবোধকুমারের প্রধান পরিচয়। তিনি সমকালীন বিজলী, কল্লোল, স্বদেশ, দুন্দুভি, পদাতিক, ফরওয়ার্ড, বাংলার কথা প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। এছাড়া বিজলী, স্বদেশ ও পদাতিক পত্রিকা তিনি নিজেই সম্পাদনা করতেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'যাযাবর' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে।

পরিব্রাজক লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অনন্য। তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি কেদারনাথ–বদ্রীনাথ ভ্রমণ করেন এবং পরে হৃষিকেশ থেকে পার্বত্য শহর রাণীক্ষেত পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মাইল পথ ৩৮ দিনে পদব্রজে অতিক্রম করেন। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনি নিয়েই তিনি রচনা করেন 'মহাপ্রস্থানের পথে'।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর তিনি হিমালয়-সংলগ্ন নানা স্থান ভ্রমণ করেন। সেই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর রচিত 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে, ৭২ বছর বয়সে, তিনি উত্তর মেরুতেও যান।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনি - 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবতাত্মা হিমালয়', 'উত্তর হিমালয় চরিত', 'পর্যটক পত্র'। এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ— 'যাযাবর' (১৯২৮), 'প্রিয়বান্ধবী' (১৯৩১), 'অগ্রগামী' (১৯৩৬), 'আঁকাবাঁকা' (১৯৩৯), 'পুষ্পধনু' (১৯৫৬), 'বিবাগী ভ্রমর', 'হাসুবানু', 'বনহংসী', 'কাঁচ-কাটা হীরে', 'নিশিপদ্ম'।

প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক, শিশিরকুমার পুরস্কার, মতিলাল পুরস্কার, শরৎ পুরস্কার এবং আনন্দ পুরস্কার (১৯৮০) লাভ করেন। ১৯৮৩ সালের ১৭ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।



ইন্টেরনেট থেকে সংগ্রহীত

মহাপ্রস্থানের পথেঃ

প্রবোধকুমার স্যান্যাল।

সংকলক :- গুঞ্জন গুহ ।

জুলাই মাস প্রবোধকুমার সান্যালের জন্মমাস। তাই জুলাই সংখ্যায় তাঁর কালজয়ী ভ্রমণগ্রন্থ ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ থেকে ‘উপক্রমণিকা’ অংশটি পাঠকদের জন্য সংকলিত করে উপস্থাপন করা হলো।

....

উপক্রমণিকা

মনের মানুষ মেলে না সংসারে, মানুষের মন তাই সঙ্গীহীন। আসলে আমরা সবাই একা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয় বাইরের প্রয়োজনে - বন্ধুত্বের প্রয়োজন, সৃষ্টির প্রয়োজন, স্বার্থের প্রয়োজন। সেদিন কম্বল, ঝোলা, লোটা ও লাঠি নিয়ে যখন নিতান্ত একাকী, হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করতে হ’লো সঙ্গী পেলাম না বলে’ সে দিন কারো উপর অভিমান করিনি, নিরাসক্ত নির্লিপ্ত মানুষ চল্‌ল নিরুদ্দেশ হয়ে ।

প্রথম বৈশাখের চিতা জ্বলছে চারিদিকে, সমগ্র “আর্যাবত” জুড়ে চল্‌চে সূর্যদেবের অভিশাপের অগ্নিবৃষ্টি, ধু ধু কর্‌চে মাঠ। সারা আকাশ মেঘের তৃষ্ণায় খা খা কর্‌চে, এমন দিনে কাশী হয়ে ছুটলাম হরিদ্বারের দিকে। যখন আমরা স্থাণু, সীমাবদ্ধ, গৃহগতপ্রাণ, শহর-সভ্যতার জোয়াল কাঁধে নিয়ে চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরি, তখন বুঝিনে এর বাইরে আছে বৃহত্তর জগৎ, উদার জীবন প্রতিদিনের লাভ-ক্ষতি, সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার পিছনে আছে একটি পরম আহ্বান, একথা ভুলে যাই। চারিদিকে যেমন জমে জঞ্জাল তেমনি জোটে মানুষ; কিন্তু যেদিন আসে পথের ডাক, যেদিন বাজে দূরের ব্যাকুল বাঁশি, সেদিন আমাদের গা-ঝাড়া দিয়ে একা একাই ছুটে বেরুতে হয়, তখন আর অপেক্ষা নেই, পিছনে চাওয়া নেই।

পার হ’লো ফয়জাবাদ,পার হ'লো লক্ষ্ণৌ, পিছনে রইল বেরিলী, গাড়ি চললো ছুটে । আমার এই যাত্রার পথে কোনো পরিকল্পনা ছিল না, আয়োজন ছিল না, এ যেমন বিশৃঙ্খল তেমনি আকস্মিক। রাত্রিশেষে

লাক্সার অতিক্রম করে যখন হরিদ্বার এসে পৌঁছলাম, তখন চেয়ে দেখি এ একেবারে নতুন রাজ্য! শীতের হাওয়ায় সর্বশরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেচে, এমন ঠাণ্ডা যে হাত-পা জড়িয়ে যায়? গরম থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দ হ'লো, শরীরে এল উৎসাহ, গতির চাঞ্চল্য। রাত্রিশেষের অন্ধকার, মাথার উপরে নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশ, আশে-পাশে কৃষ্ণকায় প্রহরীর মতো পাহাড়ের সারি, মধুর শীতল বাতাস-এদেরই ভিতর দিয়ে পথ চিনে চিনে চললাম ধর্মশালার দিকে। ধর্মশালাই তীর্থযাত্রীর অবলম্বন।

হিমালয়ের যতগুলি প্রবেশ-পথ আছে তাদের মধ্যে হরিদ্বার হচ্চে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুগম । এখানে তিনটি মাত্র ঋতু - বর্ষা, শীত এবং বসন্ত। নিকটে গঙ্গার নীলধারা, কলস্বনা, উপল-মুখরা। নদীর তীরে তীরে সন্ন্যাসীগণের আস্তানা ও আসন, ধুনি জলচে, গঞ্জিকা চল্‌চে; বেদ, গীতা, তুলসীদাসের আলোচনা। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, কুশাবর্তে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ - কোথাও চাঞ্চল্য নেই, জীবন-সংগ্রাম নেই, নির্বিবাদ এবং নির্লিপ্ত। এ সময়টায় বহু যাত্রীর ভিড়, "সকলেরই পথ বদরীনারায়ণের দিকে, চোখে-মুখে উৎসাহ, যাত্রার আয়োজন, তাদেরই সঙ্গে পাণ্ডা ও কুলীদের কচ্‌কচি। ছোট শহর, ছোট বাজার, বাজারে শীতকালের আনাজ-তরকারি থরে থরে সাজানো - ওদিকে ভোলাগিরির ধর্মশালা ও আশ্রম। আশ্রমে বাঙালীর কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তিই বেশি। সকলেই গৃহবিরাগী, গেরুয়াধারী, মুণ্ডিত মস্তক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান অনেকে আছেন, কোথাও তাঁরা আত্মপরিচয় দেন্ না, দেবার কথাও নয়। গঙ্গার তীরে এই আশ্রমে তপস্যায় তাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেচেন। শুনলাম, এই মনোরম নিভৃত যোগাশ্রমের মধ্যেও মানুষের ছোটখাটো কলহ, সংশয় ও বিদ্বেষ মাঝে মাঝে সংযম ও তপস্যার আবরণ সরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তীর্থযাত্রী ছাড়াও অনেকে এখানে এসেচেন স্বাস্থ্য ফেরাতে।

সমুদ্রের তীরে আত্মহারা মানুষ যেমন নিরুপায় ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে; হিমালয়ের তীরে দাঁড়িয়ে তেমনি করে দুরের দিকে একবার তাকালাম। লক্ষ্যহীন নিরুদ্দিষ্ট পর্বত-শ্রেণী, এর কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ কিছুই বোঝবার উপায় নেই । কোনদিকে বদরীনাথ? শুধু মেঘের পরে মেঘ, পাহাড়ের পর পাহাড় — উত্তুঙ্গ, কঠিন, নির্দয়। আমি যে আসলে নার্ভাস, ভয়চকিত, আরামপ্রিয়, দুঃসাহস আছে অথচ সাধ্য নেই-একথা এমন করে এর আগে আর বুঝতে পারিনি। মনে হলো এখনো সময় আছে, ফিরে যাই, কিংবা এখানে কোনো আশ্রমে আত্মগোপন করে থেকে মাস দুই পরে দেশে, ফিরে গিয়ে বলবো, ঘুরে এলাম ! অথচ ইতিমধ্যেই ভালো একটা লোহা-বাঁধানো লাঠি কিনেচি, ক্রেপ্‌সোল্ ক্যাম্বিসের জুতো কিনেচি। ইসব্‌গুল, মিছরি, রান্নার মশলা, হরীতকী এবং আমাশয়ের ওষুধে কাঁধের ঝোলাটা ভারী হয়ে উঠ্‌লো, যাত্রীদের কাছ থেকে আসচে অবারিত উৎসাহ ও উদ্দীপনা! কত ভয়, কত দুশ্চিন্তা, কত সান্ত্বনা। কী করি, পথের বিপদ ও কষ্টের গল্প শুনে প্রাণের

ভয় বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠ্‌চে, কেমন করে ফিরি! দেশ থেকে যদি একটা বিপদসূচক জরুরী টেলিগ্রাম আসে তো বাঁচি, এর চেয়ে জেলে যাওয়া ছিল ভালো। একবার মনেও হ'লো পথের ধারে দাঁড়িয়ে বার দুই 'বন্দেমাতরম" উড়িয়ে না-হয় গ্রেপ্তারই হই, কিন্তু মুখে আর আওয়াজ নেই, কণ্ঠে নেই শক্তি, হৃদয়ে নেই সাহস, কেবল নিরুপায় অনুশোচনায় দূর রেলপথের দিকে একবার তাকালাম। না, ফিরবার আর উপায় নেই। সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই, পরিচিত কেউ নেই। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সবাই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছে, ফেরবার আশা তারা আর হয়ত করে না, বিলিব্যবস্থা শেষ হয়ে গেছে, জীবনের মূল্য নিজেদের কাছে তাদের আর কিছুই নেই, পায়ে হেঁটে হেঁটে দেহক্ষয় করে একদিন হয়ত অন্তিম শয্যা পাতবে। এই ধর্মশালা থেকেই শীঘ্র একদল বাঙালী যাত্রী বদরীনাথ রওনা হবে। তাদের সঙ্গে একটি মাত্র পুরুষ, আর সবাই বৃদ্ধা এবং প্রৌঢ়া। স্ত্রীলোকের পুণ্যকামনা এবং তীর্থযাত্রার আগ্রহ যে পুরুষের চেয়ে বেশি, এর পিছনে একটি তত্ব হয়ত আছে কিন্তু সে কথা এখন থাক্‌। পুরুষটি ব্রহ্মচারী, মুণ্ডিতমস্তক, নাম জ্ঞানানন্দ স্বামী, জাতিতে বাঙালী, বয়সে যুবক, ভদ্র এবং শিক্ষিত, মাথায় সিল্কের গেরুয়া-পাগড়ি, পায়ে মোজা ও জুতো, গায়ের জামা, চাদর, গেঞ্জি গেরুয়ায় ছোপানো - অবস্থাপন্ন বলেই মনে হলো । সঙ্গে তাঁর মা আছেন, আর আছেন জনকুড়ি সহযাত্রিণী। সহজেই আলাপ জমে উঠলো ! বললেন, 'আপনার যাবার ত কোনো ! কারণ নেই ! এই দুর্গম পথ .. কত বিপদ .. আপনি বাড়ি ফিরে যান্‌।'

বললাম, 'সে কি, ফিরে যাবো? আমিও যে গেরুয়ায় কাপড়-চাদর ছুপিয়ে নিয়েছি, স্বামীজী!'

স্বামীজি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে একটু হাসলেন। বললেন, 'সন্ন্যাস নিচ্ছেন নাকি? সে ত আপনার জন্যে নয় ! আমার মনে হয় আপনার ফিরে যাওয়াই ভালো, এ বড় কঠিন পথ। তা ছাড়া গেরুয়া নিলেই ত আর .... সন্ন্যাসী হতে গেলে তার মন্ত্র আছে, শোধন আছে, নানা ক্রিয়াকলাপ ..... আপনাদের জন্যে আমাদের হয় বদ্‌নাম, লোকে আমাদের বিশ্বাস করতে চায় না !'

আরো দুচার কথা উপদেশ দিয়ে তিনি উঠে গেলেন । তাঁকে আর জানাতে পারলাম না যে, আমি সারাপথ এগিয়ে আসতে আসতে পিছিয়ে যাবার চেষ্টাই করেচি। কে যেন ভূতের মতো আমাকে টান্‌চে।

দু'দিন ধরে' পথে বাজারে নদীর ধারে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ালাম। কা'কে জানাই মনের কথা? বাইরে উৎসাহ প্রকাশ করেচি, যাবার আয়োজন করেচি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে আমার আর এতটুকু ইচ্ছা নেই - এ কথা আজ কে বিশ্বাস কর্‌বে? হায়, তবু যেতে হবে, আমায় না দেখে বাবা বদরীনাথের দিন আর কাট্‌চে না, আমাকে তার চাই ! বুঝলাম না এটা দৈববুদ্ধি, দুর্দৈব !

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে যাত্রা। যাদের সঙ্গে ধর্মশালায় থাকতে অল্প পরিচয় হয়েছিল তাঁদের কাছে ম্লান হেসে বিদায় নিলাম। ধর্মশালার ম্যানেজার একটি বাঙালী ছোক্‌রা নাম - চাটুয্যে, গাইয়ে-বাজিয়ে, মধুর ব্যবহারে তিনি সকল যাত্রীকে মুগ্ধ করেচেন। তিনি সকরুণ চোখে বিদায় দিলেন। পথে নেমে এলাম। পরনে গৈরিকবাস, কাঁধের একদিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা কম্বল, আর একদিকে ঝোলা, হাতে লাঠি ও দড়ি-বাঁধা লোটা, পায়ে ক্যাম্বিসের নতুন জুতো। চোখে শূন্য দৃষ্টি, হৃদয়ে অবসন্নতা, আত্মগ্লানি, প্রাণে ভয়, দেহ নিরুৎসাহ, - এমনি করেই টল্‌তে টল্‌তে পথ দিয়ে চললাম। বাজার পার হয়ে এলাম বড় রাস্তার উপর, ঋষিকেশ পর্যন্ত মোটরবাস্ পাওয়া যায়। গলা শুকিয়ে উঠেছিল, এক ঘটি সরবত খেয়ে গাড়িতে এসে উঠলাম। দশ আনা ভাড়া, পনেরো মাইলপথ। কে যেন পিছন থেকে ঠেল্‌চে । হায়রে, "মন না রাঙায়ে কি ভুল করিলে, বসন রাঙালে যোগী"।

বেলা দেখতে দেখতে গড়িয়ে এল, পাহাড়ের পদতল থেকে মাথার দিকে রোদ উঠ্‌লো, এক একজন করে' ঋষীকেশের যাত্রী এসে গাড়িতে চড়ে বসলো। কত জটলা, কত কলরব। মাথায় পাগ্‌ড়ি-বাঁধা, খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ, - একটি সাধু এসে উঠলেন। তাঁর বয়স অল্প মনে হওয়াতে এবং তাঁর কাছেও ঝুলি-কম্বল-লোটা দেখে সাহস করে' করুণ কণ্ঠে বললাম, 'আপ্ কাঁহা যায়েঙ্গে, সাধুজি ?'

মুখের দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন । গাড়ি ততক্ষণে ছেড়েচে। তাঁর হাসি সন্ন্যাসীর স্বর্গীয় হাসি নয়, বন্ধুর হাসি। বললেন, 'বদ্রীনারায়ণে । ওঁ নমো নারায়ণায়।'

চুপ করে' মুখ ফিরিয়ে রইলাম। একটু আনন্দ হ'লো, যাক্ সঙ্গী পেলাম ! কিন্তু সে-আনন্দ প্রকাশ করে' দুর্বলতার পরিচয় দিতে, বাধলো। মিনিট খানেক পরে ঝুলির ভিতর থেকে দু'খিলি সাজা পান বার করে' হাত বাড়িয়ে সাধুটি স্মিত হাস্যে বললেন, 'লিজিয়ে মহারাজ, খাইয়ে।' - বলে' অন্য হাতে তিঁনি বিড়ি বা'র করলেন।

মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালাম ! তিনি আবার হাসলেন। হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'কোথা থেকে আসছেন?'

হেসে বললাম, 'এতক্ষণ চিনতে পারিনি, আপনি বাঙালী?'

'হ্যাঁ, আপনি বদরীনাথ যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

চলন্ত গাড়ির মধ্যে আলাপ চল্‌তে লাগ্‌ল। নাম তাঁর পাগ্‌লা ভোলা ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচারী বলেই পরিচিত। বহুদিন হ'লো সংসার ত্যাগ করেছেন, পরিব্রাজক হয়ে বহু দেশ পর্যটন করেচেন। সংসারে কে আছে এবং কে নেই তার হিসাব রাখেন না, রাখার প্রয়োজনও নেই। ভগবদ্‌গীতা তাঁর মুখস্থ, - সংসার

মায়া, কর্মত্যাগেই মুক্তি, ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আত্মদান ছাড়া মানুষের গতি নেই, তুচ্ছ জীবন, মোক্ষলাভই পরম লক্ষ্য। ভক্তিভরে তাঁর বাণী শুন্‌ছিলাম। তিনি বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে আলাপ করছিলেন । বাস্তবিক, জীবনে এই প্রথম সৎসঙ্গ পেলাম !

গঙ্গার তীরে তীরে গাড়ি চল্‌চে, কোথাও উঁচুনিচু পার্বত্য পথ, মাঝে মাঝে উপলখন্ডময় শীর্ণস্রোতা ঝরণা, কোথাও কোথাও সন্ন্যাসীর আস্তানা, ছোট ছোট দেবালয়, নদীর ওপারে পাহাড়, নীচে বাব্‌লার ঘন জঙ্গল। গাড়ি ছুটে চলেচে। বাঁ দিকে রেলপথ দেরাদুনের দিকে গেছে, ছোট ছোট স্টেশন্ জনবিরল, দক্ষিণে ঋষীকেশের পথ। পথে যেতে পড়লো ভীমগোড়া চটি। এখানে আছে একটি গুহা, পুরাকালে ভীমের অশ্বক্ষুরাঘাতে গুহার ক্ষত নাকি গভীর হয়েছিল। তারপর এল সত্যনারায়ণের মন্দির, মন্দিরের কাছে কালীকম্বলীওয়ালার সদাব্রত চটি। যারা দাগী সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁরা বিনামূল্যে এখানে আহার ও আশ্রয় পেয়ে থাকেন। গাড়ি কয়েক মিনিটের জন্য থামলে ব্রহ্মচারী নেমে মন্দির দর্শন করে এলেন। দেব, দ্বিজ ও সন্ন্যাসীতে তাঁর অবিচলিত ভক্তি!

দিনের অবসান হয়েছে, পশ্চিম দিগন্তের রক্তলেখা ইতিমধ্যে কখন ম্লান হয়ে গেচে, বনচ্ছায়া ও পর্বতের অন্ধকারে ঝিল্লীরব জেগে উঠেচে, গাড়ি এসে থামলো ঋষীকেশের এক ধর্মশালার নিকটে। সবাই নেমে এলাম। এতক্ষণে একটু নির্ভয় হয়েচি। কাছেই কালীকম্বলীওয়ালার বিরাট ধর্মশালা, এখানেই তাঁদের হেড আপিস্। এই কম্বলীওয়ালা ছিলেন এক সাধু। অখ্যাত, নগণ্য এই সাধু গিয়েছিলেন বদরীনাথে, সম্বল ছিল একখানি মাত্র কালো কম্বল। পথে পেয়েছিলেন অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট, উপবাসে দিন কাট্‌তো, দরিদ্র যাত্রীদের কাছে দরিদ্র সাধুর ভিক্ষাও জুটুতো না। কিন্তু এই মহাপুরুষ একদিন নাকি আপন পরিশ্রম ও চেষ্টায়, হৃদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে দেশে দেশে ভিক্ষা সংগ্রহ করে নিরুপায় সাধু – সন্ন্যাসীদের দুঃখ লাঘব করেচেন। তারই কৃপায় এখন পথের মাঝে মাঝে 'সদাব্রত' প্রতিষ্ঠা হয়েচে। আজ তিনি এ জগতের কোথাও নেই, কিন্তু অসংখ্য নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর নতমস্তকের প্রণাম নিরন্তর তার পদপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছয়।

ব্রহ্মচারী বললেন, ‘আমাকেও ত সদাব্রত নিতে হবে দাদা ! গরীব লোক, সেই আশাতেই ত এসেচি। আপনি একটু বলে কয়ে দিন্ দয়া করে।’

ভিতরে লোকজনের জটলা, কোলাহল, যাত্রীর ভিড়, ঘারের ভিতর দিয়ে পথ কেটে গদীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হিসাবপত্র নিয়ে গদীর ম্যানেজার ও কেরানি বসে রয়েচে। আশেপাশে প্রায় জন পঁচিশ তিরিশ সাধু-ভিক্ষুক করজোড়ে করুণনেত্রে দণ্ডায়মান কেউ কেউ প্রত্যাখ্যাত হয়ে আপন আপন অবস্থার কথা নিবেদন করচে, কেউ বদরীনারায়ণের শপথ করে বলচে, সে প্রকৃতই সন্ন্যাসী, পরের

মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ভ্রমণের সখ নিয়ে সে আসেনি, সে নিতান্তই নিরুপায় তীর্থযাত্রী। ভাবগতিক দেখে ব্রহ্মচারীর মুখখানি শুকিয়ে গেল! এবং যখন সত্যিই শুন্‌লো, সেও সদাব্রতের টিকিট পাবে না, তখন সে সেইখানে বসে পড়ে বললে, ‘কি হবে দাদা আমি যে অনেক আশা করে... শুনেছিলাম যে আসে সে-ই টিকিট পায় !’

এ কথা সে জানে না, পৃথিবীতে এত বড় দানশীলতা কোথাও নেই। দান সম্বন্ধে কড়াকড়ি আছে বলেই দানের এত মূল্য !

অতএব নিরাশ হয়ে ব্রহ্মচারীকে ফিরতে হ'লো। তার মুখের চেহারা দেখে ভয় পেলাম, যে উৎসাহ ও আনন্দ দেখেচি তার পথে, সেটুকু নিঃশেষে মুছে গেল, কণ্ঠ হলো রুদ্ধ, সর্বহারার মতো হতাশা-ম্লান চোখে তাকিয়ে সে বললে, “তবে ফিরে যাই........ সামান্য পাঁচ সাত টাকা নিয়ে এতদিনের পথ .....ফিরেই যাই তাহ'লে !’

মনটা খারাপই হয়ে গেল। বললাম, ‘ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী, সত্যি আর ত আর উপবাস করে পথ হাঁটা যায় না!’

পরমুখাপেক্ষার চেহারাই এমনি। যখন সে আশায় জ্বলে তখন দাবানল, যখন নিবে যায় তখন সে একেবারেই ভস্মস্তূপ। ব্রহ্মচারী যখন নিতান্ত বালকের মতো সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগল, সে সময় স্পষ্টই অনুভব করলাম, ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস তার শিথিল হয়ে এসেচে। সদাব্রত না পেয়ে তার দারিদ্র্যের সত্য রূপটা আমার চোখে বিসদৃশ হয়ে ফুটে উঠলো।

নীলধারার তীরে এসে বসলাম ! অন্ধকার নদী, তরঙ্গসঙ্কুল, জলের উপরে নক্ষত্রেয় আলো ঝল্‌মল্‌ করচে, ভয়ভীষণ ও রহস্যময়, পর্বতের গভীর গহ্বর থেকে কালো জল বন্য জন্তর মতো চীৎকার করে ছুটে আসচে, স্রোতের অবিশ্রান্ত শব্দে চারিদিক মুখর। তীরে বহুদূর পর্যন্ত কোথাও কোথাও ধুনি জালিয়ে সন্ন্যাসীরা আসন পেতেচে। একটি নিরুদ্বেগ, নিবিড় প্রশান্তি। তপস্যার উপযুক্ত স্থান বটে।

একখানা বড় পাথরের উপর দু’জনে নিঃশব্দে বসেছিলাম। পাথরের গা বেয়ে জল ছুট্‌চে। একাই যাবো, তাকে ফিরে যেতেই হবে, কিন্তু কী বলে সাত্বনা দেব তাই ভাবছিলাম, অথচ এক্ষেত্রে সকল সান্ত্বনাই উপহাসের মতো শোনাবে ! আমার এ সমস্যার সে নিজেই সমাধান করে’ নিল। অন্ধকারে সে তার আবেগ-আকুল দুই চোখ তুলে আমার একটি হাত ধরে বললে, 'দাদা, এত পরিশ্রম আমার পণ্ড হ'লো, ফিরেই তবে যেতে হবে, কি বলেন?

বললাম, ‘তাই ত ভাবচি।‘

সে বললে, "ভদ্রলোকের ছেলে আমি, তবু আপনার কাছে বলতে আমার বাধবে না, যদি কখনো দিন পাই আপনার দেনা আমি শোধ করব। ফিরে আর যাব না, পথে যেন উপবাস না করতে হয়, এই আপনার কাছে প্রার্থনা। ফিরে আর আমি যাবো না দাদা।

"কত দুঃখে যে এসেচি সে আপনাকে কী বল্‌ব ছ'শো মাইল পথ হেঁটে একদিন হরিদ্বারে এসে পৌঁচেছিলাম ...আর কোনো সাধ নেই দাদা, বুঝলেন? একটিমাত্র আশা, মনের মতন একটি মঠ করে যাবো। বহুকাল থেকে বদরী যাবার ইচ্ছে, কতদিন ভেবেছি মনে মনে।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললাম, "চলুন, যা হবার তাই হবে। ফিরে গিয়ে আর কাজ নেই, উপবাস যদি করতেই হয়, দু'জনেই একসঙ্গে করব। চলুন, রাত কাটাবার একটা জায়গা দেখে নিইগে।'

অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ব্রহ্মচারী শুধু বললে, 'চলুন দাদা।'

অনেক অনুসন্ধান এবং সুপারিশের পর হাসপাতালের পাশে এক যাত্রিশালায় রাত্রিবাসের জায়গা পাওয়া গেল। যাত্রিশালার দালানে জায়গা অতি সঙ্কীর্ণ। অন্ধকারে বসে জনকয়েক গাড়োয়ালী কুলী-মজুর জটলা করছিল, শ্রদ্ধাসহকারে আমাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে বসল। ভিতরে চেয়ে দেখি, একদল যাত্রী। বাংলা ভাষায় তাদের আলাপ শুনে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একটি প্রায়-বৃদ্ধ ব্যক্তি অভ্যর্থনা করে বসালেন। সমস্ত ঘর জুড়ে জন পনেরো স্ত্রীলোক এখানে ওখানে ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে। বললাম, 'কোথা থেকে আসচেন আপনারা?'

'কালীঘাট থেকে। আপনারা?'

'আমি আসচি কাশী থেকে, উনি পরিব্রাজক'

লোকটির এতখানি দাড়ি, যাত্রাওয়ালার যতো মাথার চুল, পরনে গেরুয়া, গায়ে একটা গরম ওয়েস্ট-কোট, পায়ে পাহারাওয়ালার মতো কালো বনাতের ফেট্টি বাধা। ছোট্ট একটা কল্‌কেয় তামাক সাজছিলেন। বললেন, "আপনি ?

বললাম, 'ব্রাহ্মণ, - আহা হা, করেন কি? আমি যে বয়সে অনেক ছোট !'

'তা হোক, কেউটের বাচ্চা।' বলে' তিনি হঠাৎ জোর করে আমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন। বললেন, 'বুড়োমানুষ, এত গুলি মেয়েছেলে নিয়ে এই দুর্গম পথে ..... একটু দেখবেন দয়া করে। পথের সঙ্গী!' - ঝুলি থেকে দু"টি বিড়ি তিনি আমাদের বা'র করে দিলেন।

তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আবার বাইরে এলাম। আলো জ্বাল্‌বার উপায় ছিল না। অন্ধকারে কম্বল ছড়িয়ে পাশাপাশি দু'জনে শুয়ে পড়লাম। ব্রহ্মচারী হাই তুলে তুড়ি দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার অভ্যাস মতে বলে উঠলো, ওঁ নমো নারায়ণায় ও তৎসৎ।

নির্জন, নিস্তব্ধ রাত্রি চারিদিকে তখন থম্ থম্ ক্‌রচে। গঙ্গার জলের শব্দ এতদূর থেকেও শুনতে পাচ্ছিলাম।

যাত্রা

বৈশাখ, ১৯, ১৩৩৯। সেদিন প্রথম আমাদের পদব্রজে যাত্রা শুরু হ'লো। কাঁধে বোঝা আর হাতে লাঠি নিয়ে দুই বন্ধুতে পথে নেমে এলাম। ......

হরিদ্বার

Picture is Collected from wilkipedia

By KaustubhNayyar - Own work, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59761668



ভীমগোড়া কুণ্ড

Picture is Collected from



শ্রী বাবা কালিকাম্বলিওয়ালা পঞ্চায়েত ক্ষেত্র শ্রী সত্য নারায়ণ মন্দির, ঋষিকেশ

ছবি – ইন্টারনেট থেকে সগৃহিত।



ঋষিকেশ

ছবিঃ By mckaysavage -

https://www.flickr.com/photos/mckaysavage/2085710183/, CC BY 2.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4451965



সূচিপত্র


ভ্রাম্যমাণের কাব্যকুসুম

‘ভ্রাম্যমাণের কাব্যকুসুম'

এই বিভাগটিতে আমরা সংকলন করছি বাংলা কবিতায় বিশেষভাবে বিভিন্ন রম্যস্থান ও দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শনের এবং সাধারণভাবে মানুষের ভ্রমণলিপ্সার বিভিন্ন কাব্যিক অভিব্যক্তির নির্বাচিত অংশ। এবারের সংকলিত কবিতাটির রচয়িতা শ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন মল্লিক ।

কবি পরিচিতি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, (১৮৮৩-১৯৭০) শিক্ষাবিদ, কবি। ১৮৮৩ সালের ১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কোগ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস একই জেলার শ্রীখন্ড গ্রামে। পিতা পূর্ণচন্দ্র মল্লিক ছিলেন কাশ্মীর রাজসরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

কুমুদরঞ্জন ১৯০১ সালে এন্ট্রান্স, ১৯০৩ সালে রিপন কলেজ থেকে এফএ এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। পরে বর্ধমানের মাথরুন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং সেখান থেকেই ১৯৩৮ সালে প্রধান শিক্ষকরূপে অবসর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, কাজী নজরুল ইসলাম ওই স্কুলে তাঁর ছাত্র ছিলেন।

কুমুদরঞ্জনের কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটে বাল্যকালেই। পল্লীর মানুষ ও প্রকৃতি তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়। তাঁর কবিতায় নির্জন গ্রামজীবনের সহজ-সরল রূপ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পল্লী-প্রবণতার সঙ্গে বৈষ্ণবভাবুকতা যুক্ত হয়ে তাঁর কবিতার ভাব ও ভাষাকে স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য দান করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাঙলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে।’ তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: উজানী (১৯১১), বনতুলসী (১৯১১), শতদল (১৯১১), একতারা (১৯১৪), বনমল্লিকা (১৯১৮), নূপুর (১৯২০), রজনীগন্ধা (১৯২১), অজয় (১৯২৭), তূণীর (১৯২৮), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮) ইত্যাদি।

কুমুদরঞ্জন বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান সাহিত্যতীর্থের ‘তীর্থপতি’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক’ (১৯০৫) ও ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ এবং ভারত সরকার কর্তৃক ‘পদ্মশ্রী’ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

জুলাই মাসে পুরীসহ সারা দেশে রথযাত্রা উৎসব পালিত হল, এই বিশেষ উৎসবকে উপলক্ষ করে শ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন মল্লিকয়ের রচিত চণ্ডালী (রথযাত্রা) কবিতাটি এই জুলাই মাসের ই-ম্যাগাজিনে ‘ভ্রাম্যমাণের কাব্যকুসুম' বিভাগে, প্রস্তুত করা হল।


Kumud Ranjan Mallick

চন্ডালী (রথযাত্রা) : কুমুদ রঞ্জন মল্লিক

সংকলক :- গুঞ্জন গুহ ।

রথযাত্রা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বৃদ্ধ খঞ্জ চণ্ডালী এক শ্রীমুখ দেখিতে রথে
একাকিনী যায়, চলে ধীরি ধীরি মেদিনীপুরের পথে।
দিবসে যে শুধু হাঁটে এক ক্রোশ, তাহার একি গো দায়,
গৃহ হতে দূরে একশত ক্রোশ পুরীধাম যেতে চায়।
দলে দলে চলে পুরীর যাত্রী খোঁজ করে কেবা কার!
সেই সবাকার পিছু পড়ে থাকে, চলিতে পারে না আর।
রথযাত্রার যবে শুধু আর দুই দিন বাকি আছে,
বহু কষ্টে সে পঁহুছিল সাঁঝে আসি কটকের কাছে।

"কোথা যাবি বুড়ি?"—পথিক জনেক শুধালো সেখানে তারে।
বৃদ্ধা বলিল—"চলিয়াছি বাবা, চাঁদমুখ দেখিবারে।"
ঈষৎ হাসিয়া কহিল সে-জন—"কেমনে পারিবি বুড়ি,
রাত পোহালে যে কাল রথ খেপী, দেখিবি কেমন করি'?"
শুনি চণ্ডালী রুষিয়া বলিল—"বাকি যে এখনও পথ,
কি বলিছ তুমি রাতি পোহাইলে কেমনে চলিবে রথ?"
হাসিয়া পথিক বলিল—"তাই তো, চল্ তাড়াতাড়ি চল্—
তুই, খেপী, যদি না যাইবি সেথা, রথ কে টানিবে বল্!"

ঘুমাইল বুড়ি, রজনী প্রভাতে উঠে বলে—"চল যাই"—
দুটি পা তাহার বেদনা-জড়িত উঠিতে শকতি নাই।
আড়ষ্ট ব্যথা, পারে না নড়িতে, তবু দিয়া হামাগুড়ি,
রথেতে দেখিবে শ্রীমুখ বলিয়া চলিতে লাগিল বুড়ি!

ভক্ত কত না জুটেছে শ্রীধামে, রথযাত্রা যে আজি,
কাঙালের হরি উঠেছেন রথে অভিনব বেশে সাজি,
একি অঘটন, একি হল আজ, চলে না দেবের রথ!
অজুত ভক্ত টানে রশি ধরি, কর্দমহীন পথ।
জুড়িল হস্তী তবু যে গো রথ তেমনি রহিল থির;
ভাবনা-ব্যাকুল প্রধান পাণ্ডা, ঝরে নয়নের নীর।
ধুলার মাঝারে লুটায়ে পাণ্ডা জানিতে পারিল ধ্যানে—
প্রবল ভক্ত কে-এক রথের পশ্চাৎ দিকে টানে।
যাবৎ না ছোঁয় সমুখের রশি শুচি করতলে তার,
হাজার হস্তী রথের চক্র নড়াতে নারিবে আর।

বাহির হইল পাণ্ডার দল ভক্ত-অন্বেষণে—
কৌপীন-পরা সন্ন্যাসী যত ধরে আনে জনে জনে।
তিলক-ভূষিত নামাবলী-ধারী বৈষ্ণব আনে ধরে,
কাহারো পরশে সে বিরাট রথ এক তিল নাহি নড়ে!
খুঁজিতে খুঁজিতে বহুদূরে আসি প্রধান পাণ্ডা, হায়,
দেখিল খঞ্জ বৃদ্ধা জনেক পুরী অভিমুখে যায়।
হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ি; পাণ্ডা শুধালো তারে—
"এ খর-রৌদ্রে ভিক্ষার লাগি যাইবি কাহার দ্বারে?
তপ্ত বালুতে পুড়িতেছে পথ, আঁখি ভরে গেছে জলে—
দিনু এই সিকি, ফিরে গিয়ে বোস্ ওই অশথের তলে।"

বুড়ি বলে—"বাবা, বল কবে রথ, পয়সাতে কাজ নাই,
রথেতে দেখিব শ্রীমুখ বলিয়া রোদে চলিয়াছি তাই।"
শুনি ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধারে বুকে করি
"পেয়েছি, পেয়েছি"—বলিয়া ছুটিল পুরীর সড়ক ধরি।
ব্যাকুল বৃদ্ধা বলে—"দাও ছাড়ি, বাবা গো চাঁড়াল মুই।"
ব্রাহ্মণ বলে—"দে মা পদধূলি, গুরুর গুরু যে তুই।"

চকিতে দেখিল যাত্রীরা সবে,"জয় জয় জয়" বলে—
প্রধান পাণ্ডা আসিল যে সেই খোঁড়া বুড়ি লয়ে কোলে।
অচল সে রথ চলিতে লাগিল, বুড়ি দিল যবে হাত—
উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিল—"ধন্য জগন্নাথ!"
সাশ্রু-নয়নে অজুত ভক্ত গাহিল ভক্তি-গান—
"সত্যই তুমি কাঙালের হরি ভক্তের ভগবান!"



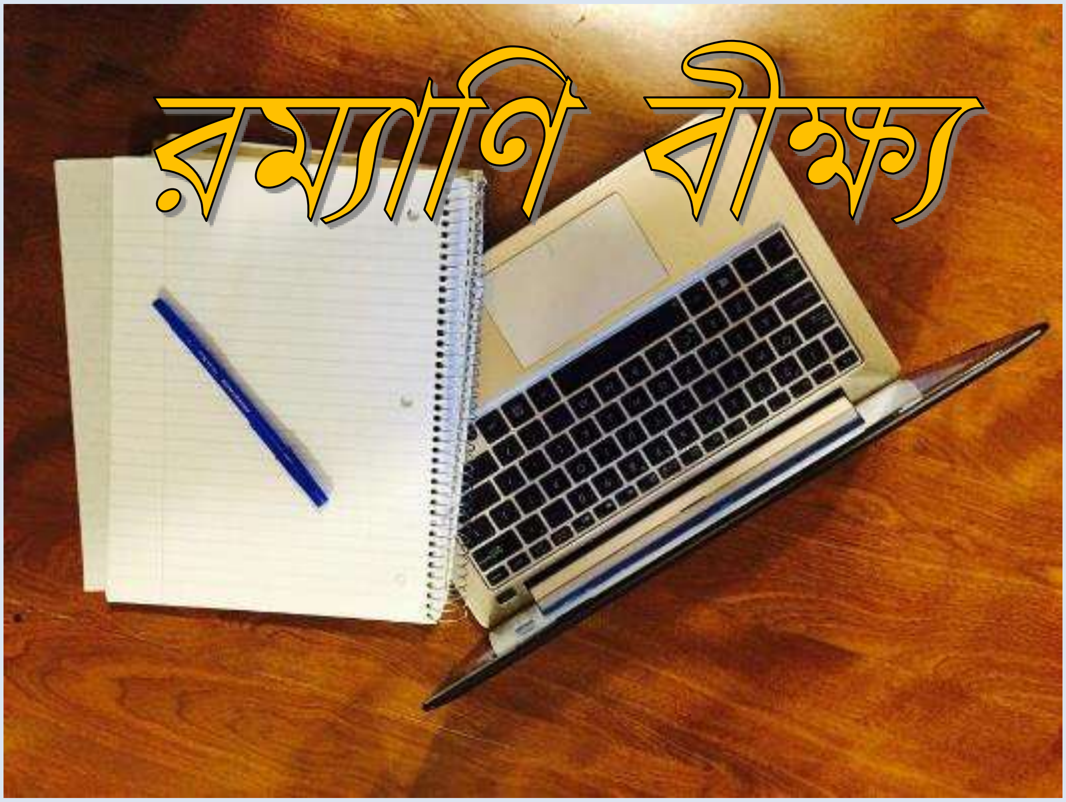
Government of Odisha - From Twitter account of Naveen Patnaik

ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।





সুচিপত্র



রবীন্দ্রনাথের সেই বহুশ্রুত কবিতিকাটির শুরুতেই আছে "বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে/ বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে/ দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা/ দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু...." ইত্যাদি। সৌন্দর্যপিয়াসী ভ্রমণকারী যদি সৃজনশীল হন, তিনি দেশবিদেশে ভ্রমণের আনন্দ শুধু নিজের মধ্যে না রেখে ছড়িয়ে দেন লেখার মাধ্যমে। সেই লেখা কখনো গদ্যে কখনো বা কাব্যের মাধ্যমে পাঠকের মনকে সঞ্জীবিত করে। 'রম্যাণি বীক্ষ্য' মানে 'সুন্দরকে দেখে'। সেই সুন্দর বা রম্য হতে পারে কোনো সুন্দর স্থান, নদী পর্বত অরণ্য সাগর দেবালয় নগর স্মৃতিসৌধ এবং আরো কত কিছু। সেই রকম কিছু নিয়েই 'রম্যাণি বীক্ষ্য' বিভাগের বিষয়- গদ্যে লেখা কোনো ভ্রমণ কাহিনী।

আদিবুদ্ধ ও রিনচেনপং

শিবাংশু দে



Shibanshu De

আদিবুদ্ধ ও রিনচেনপং

যখন পশ্চিম তিব্বত বা লদাখ গিয়েছিলুম, বিভিন্ন গোম্পায় আদি বুদ্ধের বিগ্রহমূর্তি আমার সন্ধানে ছিলো। বজ্রযানের শাখা তিব্বতীয় লামাযানে এই দেবতার বেশ প্রভাব রয়েছে। লামাযানের সঙ্গে শাক্যমুনি বুদ্ধের বিশেষ সম্পর্ক নেই। নামটুকু ছাড়া। এই সাধনপন্থাটি একান্ত ভাবেই আগম ও তন্ত্রভিত্তিক ধারণা ও ক্রিয়াকলাপে পূর্ণ। সাহেবরা যাকে 'অকাল্ট' বলে থাকেন। খুঁজে পাইনি।

রিনচেনপং পশ্চিম সিকিমেরও একটা মোটামুটি দুর্গম জায়গা। গেজিং-এর দক্ষিণে, রাবংলার দক্ষিণ পশ্চিমে একটা মোটামুটি অজানা গ্রাম। সিকিম যাবার আগে যখন কিঞ্চিৎ গবেষণা করতে গেলুম, তখন দেখলুম আদি বুদ্ধের একটি প্রাচীন বিহার রয়েছে রিনচেনপং-এর কাছাকাছি। নামটা জুড়ে গেলো আমার অন্যতম গন্তব্য হিসেবে। বস্তুত গিয়ে দেখলুম উদ্দিষ্ট বিহারটিকে রিনচেনপং-এর 'ছাদ' বলা যেতে পারে। গ্রাম পেরিয়ে একটা উঁচু পাহাড়। তার চূড়ায় রয়েছে এই বিহারটি। তেরো শতকে প্রথম তার শিলান্যাস হয়। বর্তমান রূপে এসেছিলো আঠেরো শতকে। তিনশো বছর মানে যথেষ্ট প্রাচীনই বলতে হবে।

কিছুটা গাড়ি, বাকিটা হেঁটে ওঠা গেলো অকুস্থলে। বেলা বেড়ে গিয়েছিলো। গিয়ে দেখি সদর দরজায় তালা। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে একজন লামাকে পাওয়া গেলো। অনুরোধ করতে তিনি খুলে দিলেন। ভিতরটা একটু ছায়া ছায়া। টিমটিম প্রদীপের আলো। যেমন হয় বৌদ্ধ বিহারের ঠাকুরঘর। আমার হাতে ক্যামেরা দেখে লামা বললেন ভিতরে ছবি নেওয়া বারণ। আমি মাথা নাড়ি। কেন বারণ, তার কারণ না দেখালে আমি সব দেবস্থানেই ছবি নিই। তিনিও নিয়মরক্ষা করে চলে গেলেন। আমিও ঠাকুরঘরে না ঢুকে জুম করে, আই-এস-ও বাড়িয়ে, স্লো শাটার কয়েকটা ফ্রেম নিলুম। কিন্তু হলো না। তখন ভিতরে ঢুকতেই হলো। ফ্ল্যাশ ছাড়া ও ছবি উঠবে না। মনে মনে ঠাকুর মাফ করো বলে গোটা দশেক বিভিন্ন কোণ থেকে ছবি নিয়েই নিলুম। কিন্তু সামন্তভদ্রের মূর্তি ওভাবে ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখলে তার তাৎপর্যই হারিয়ে যায়। কী আর করা?

এই দেবতা শাক্যমুনি নন। তিব্বতি লামাযানের প্রতিষ্ঠিত একজন দেবতা। তন্ত্রমতের দেবকল্পনা। তাঁর অবয়ব হিসেবে পুরুষ ও প্রকৃতির মিথুনমূর্তিকে কল্পনা করা হয়েছে। তিব্বতি শাস্ত্রে এর নাম 'য়াব-য়ুম'। 'য়াব' পুরুষ ও 'য়ুম' প্রকৃতি। বিগ্রহের নাম 'সামন্তভদ্র' বা 'কুন্তুজ্যাংপো'। পুরুষ মূর্তি নীলবর্ণ, প্রকৃতি শ্বেত বর্ণ। অনন্ত আকাশের প্রতীক এবং নগ্ন। পুরুষকে আলিঙ্গন করে প্রকৃতি বা প্রজ্ঞা কণ্ঠলগ্না হয়ে আছেন। এর উৎস রয়েছে মহাযানী 'শূন্যবাদী' দর্শনের মধ্যে। শূন্যবাদী সাধকরা আকাশকেই অনন্ত শূন্যতা মনে করতেন। আমাদের কবি যাকে বলেছেন,

'সৃষ্টিকে যে লয় আবরি, সেই মা নাকি দিগম্বরী-
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্বসন।।'

এই রূপকল্পটির মধ্যে লামাযানী সাধকরা জ্ঞান ও করুণার সম্মিলন সন্ধান করেছিলেন।

লদাখে খুঁজে পাইনি। কিন্তু পশ্চিম সিকিমের এক প্রত্যন্ত গ্রাম রিনচেনপং-এর পাহাড়চূড়ায় তেরো শতকে স্থাপিত 'সাং ঙ্গাগ ইয়াংজে' বিহারে আদিবুদ্ধের মূর্তি খুঁজে পেলুম। নীল দেবতার কণ্ঠলগ্না প্রজ্ঞার কেশদামটিই শুধু দেখা যায়। বাকিটা আবৃত। বছরে একবার মাত্র তাকে অনাবৃত করা হয়। বজ্রযানী ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে, এই বিগ্রহ তারই একটি নিদর্শন। ভারতবর্ষ আমাকে তার মায়ায় সতত বেঁধে রাখে।

পৃথিবী'র মুখ খুঁজিতে যাই না আর....




Sang Ngag Yantze Monastery,
Overlooking Rinchenpong,
West Sikkim,
Shibanshu


Sang Ngag Yantze Monastery,
Overlooking Rinchenpong,
West Sikkim,
Shibanshu


Adi Buddha Samantabhadra
Sang Ngag Yantze Monastery,
Overlooking Rinchenpong,
West Sikkim,
Shibanshu


Sang Ngag Yantze Monastery,
Overlooking Rinchenpong,
West Sikkim,
Shibanshu

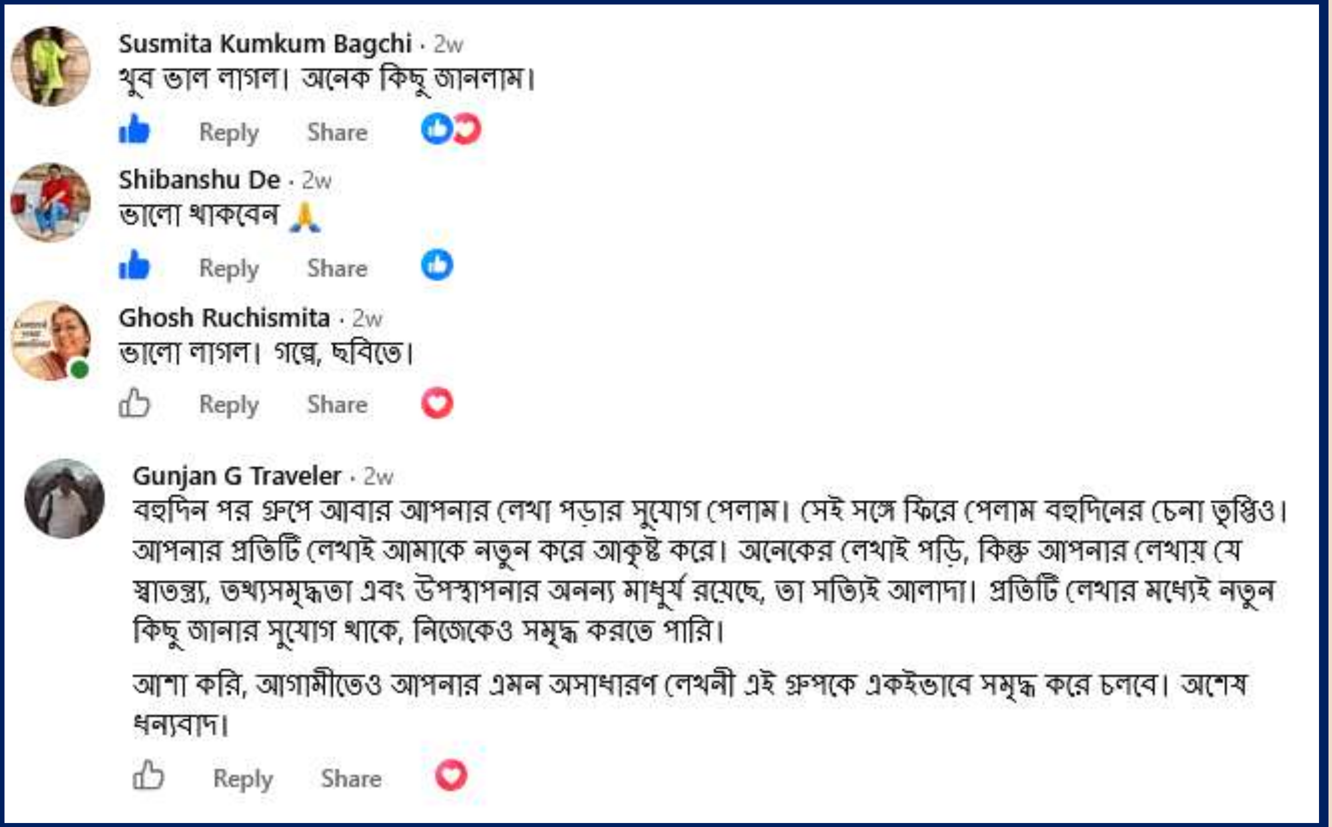

Sang Ngag Yantze Monastery,
Overlooking Rinchenpong,
West Sikkim,
Shibanshu


Sang Ngag Yantze Monastery,
Overlooking Rinchenpong,
West Sikkim,
Shibanshu


Lama boys playing cricket
Sang Ngag Yantze Monastery,
Overlooking Rinchenpong,
West Sikkim,
Shibanshu



Selected Comments



Susmita Kumkum Bagchi · 2w
খুব ভাল লাগল। অনেক কিছু জানলাম।
Reply Share

Shibanshu De · 2w
ভালো থাকবেন 🙏
Reply Share

Ghosh Ruchismita · 2w
ভালো লাগল। গল্পে, ছবিতে।
Reply Share

Gunjan G Traveler · 2w
বহুদিন পর গ্রুপে আবার আপনার লেখা পড়ার সুযোগ পেলাম। সেই সঙ্গে ফিরে পেলাম বহুদিনের চেনা তৃপ্তিও। আপনার প্রতিটি লেখাই আমাকে নতুন করে আকৃষ্ট করে। অনেকের লেখাই পড়ি, কিন্তু আপনার লেখায় যে স্বাতন্ত্র্য, তথ্যসমৃদ্ধতা এবং উপস্থাপনার অনন্য মাধুর্য রয়েছে, তা সত্যিই আলাদা। প্রতিটি লেখার মধ্যেই নতুন কিছু জানার সুযোগ থাকে, নিজেকেও সমৃদ্ধ করতে পারি।

আশা করি, আগামীতেও আপনার এমন অসাধারণ লেখনী এই গ্রুপকে একইভাবে সমৃদ্ধ করে চলবে। অশেষ ধন্যবাদ।
Reply Share

সুচিপত্র

লুংচুর ললিত লাস্য

শিবাংশু দে



Shibanshu De

লুংচুর ললিত লাস্য

আম্বিওক চা-বাগান আর জঙ্গল রেঞ্জ পেরিয়ে একটু গেলেই নেওরা উপত্যকার জাতীয় অরণ্যমালা। উত্তরদিকে যে রাস্তাটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে তার নাম 'লাভা রোড', কখনও বা 'রিশি রোড'। হয়তো একই রাস্তা লাভা আর রিশপ দুই পাহাড়েই যায়। তাই নামও ভাগাভাগি করা। নেওরা অরণ্যপথের বর্ণনা শব্দ সাজিয়ে করতে পারা বেশ চ্যালেঞ্জিং। চোখ থেকে অক্ষরে তার অনুবাদ করতে গেলে দৈবী কলম লাগে। অধমের সে রকম এলেম নেই। রাস্তাটা যেখান থেকে দুভাগ হয়ে যায় তার বাঁদিকে লাভা বাজার। ডানদিকে কোলাখামের পথ। এই পথটি টানা চড়াই, পাহাড় ঘুরে ঘুরে। লাভা বাজার পর্যন্ত পথ পাহাড়ি হলেও তেমন ভাবে শরীরের খাঁচা নাড়িয়ে দেয় না। রাস্তাটি জখমি হলেও বোঝা যায় কখনও পলেস্তারা করা হয়েছিলো। কিন্তু লাভা বাজার থেকে ডাইনে মোচড় মারা পথটি গাড়ি যাওয়ার অনুপযুক্ত। মানুষ যায়, তাই তার নাম পথ। নয়তো আমাদের মতো শহুরে জনতার পক্ষে এক কথায় নরক যন্ত্রণা।

এই পথের উপরে আছে কোলাখাম নামের একটি গ্রাম। চাঙ্গে জলপ্রপাত। একদম শেষে একটি নির্জন পাহাড়ি গ্রাম 'লুংচু'। লাভা বাজার থেকে পঁচিশ কিমি। তবে 'পঁচিশ' দেখে আশ্বস্ত হবার নয়। আমাদের মতো পাহাড়ে পাহাড়ে পায়ের তলায় সর্ষে নিয়ে চলা পাবলিকেরও মনে হয় এবার ক্ষ্যামা দে রে বাপ। যদিও আমরা সর্বদা উঁচু এসইউভি গাড়ি নিয়েই ঘোরাঘুরি করি। কিন্তু মনে পড়ে যায় 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ। 'অন্ধ জাগে, কী বা রাত্রি, কী বা দিন।' ধম্মোপুত্র সম্ভবত এমন একটি রাস্তা বেয়েই মহাপ্রস্থানে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন।

একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে সামনে দেখি একটা ফুট চল্লিশ সংকীর্ণ খাড়া চড়াই। ষাট-সত্তর ডিগ্রি হবে। ঝুরো মাটি আর আলগা নুড়ি পাথরের জমি। ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো। বোলেরো গাড়ির চারটে চাকা আঁটবে বড়ো জোর। সারথিকে বলি, পারবে? না আমরা নেমে যাই? সে বলে, মনে হয় পেরে যাবো। না পারলে গাড়ি পিছন দিকে গড়াবে। স্টিয়ারিং শক্ত হাতে ধরতে হবে। তা সে ফার্স্ট গিয়ারে টেনে দিলো। উপরে ছোট্টো একটা কাঁচা পার্কিং-এর জায়গা। গোটা তিনেক এসইউভি ঠাসাঠাসি করে ধরতে পারে।

তার পর কাঁচা রাস্তায় অনেকটা চড়াই । কতোটা, সেটা নিচের থেকে বোঝা যাচ্ছে না। খালি হাতে চড়ে যাবো। কিন্তু মালপত্র নিয়ে সম্ভব নয়। দেখি, গাড়ির হর্ন শুনে তিনটে মেয়ে তরতর করে নেমে আসছে। ফুটফুটে পাহাড়ি মেয়ে। আমাদের চোখে বালিকাই মনে হয়। আমাদের স্বাগত জানিয়ে মালপত্রগুলো অবলীলায় টেনে নিয়ে চড়তে থাকে। আমরা তাদের পিছন পিছন যেতে থাকি। পৌঁছে যাবার পর মনে হলো প্রায় ছ-সাত ঘন্টার পাঁজরভাঙা পরীক্ষা দিয়ে এসে কোনও অমরাবতী অপেক্ষা করছিলো আমাদের জন্য।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, সব থেকে সুন্দর জায়গাটায় পৌঁছোবার পথটি সব সময়েই অতি নিকৃষ্ট হয়। বার বার এই উক্তির প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু এইবার যেন কিঞ্চিৎ অধিকই হয়ে গেলো। ধাপে ধাপে সাজানো বাগান। ভরা বসন্তে তার উচ্ছ্বাস ফুরোয় না। 'ফাগুন হাওয়ায়, রঙে রঙে পাগলঝোরা লুকিয়ে ঝরে।' হাজার রকম রডোডেনড্রন, অর্কিড, মরশুমি ফুলকুমারীর দল ঠাণ্ডা হাওয়ায় দোল খেয়ে যাচ্ছে। তিন ধাপ জোড়া বাগান। সব চেয়ে উঁচু ধাপে দোতলা কাঠের বাংলোবাড়ি। ঢালু ছাদ, পাইন কাঠের দেওয়াল। সামনের দিকে তাকালে একের পর এক পাহাড়ের সারি ঘিরে রেখেছে চারদিক। মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। তাদের পিছনেই নাকি তাঁকে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেখা দেননি তিনি। তবে আপশোস নেই। মেঘের খেলা আকাশ পারে আমাকে সতত মুগ্ধ করে। সবুজের সাম্রাজ্যে মেঘ, আকাশ, আলো আর অন্ধকার সমানে খেলা করে গেলো।

ব্রাহ্মণীর কলকাতায় গরম লাগে। তাঁর জন্ম রউরকেলায়। বেড়ে ওঠা টাটাবাবার শহরে। জীবন কাটলো সিংভূম, পাটনা, ভুবনেশ্বরে। এদেশের সব চেয়ে আগুনে ঠেকগুলো পেরিয়ে এসেছেন। তবু লাগে। তাপের তপের ঋতুগুলি পাহাড়ে পাহাড়ে কাটিয়ে আসি। যেদিন লুংচু পৌঁছোলুম, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এক অপরাহ্নে। এদেশে পাহাড়ি ঠেক যতো আছে, কাশ্মীর থেকে কুনুর, শিলং থেকে সোলাং, ঘরবাসী সব সরাইখানার ভোজন আয়োজন একই থাকে। মেনু বাঁধা। আমাদের মতো পাতি জনতার জন্য বেশ স্বস্তিজনক। সৌন্দর্য্য শুধু চোখেই বাঁধা থাকে না। ভিতরটাও ভরে যায়। অতি মাত্রায় উদর-মনস্কতা অস্বস্তিতে ফেলে। মাছের টুকরো মাপা বঙ্গো বা ত্রস্ত নিরামিষাশী গুজু ভাইদের দুঃখের গল্প উপেক্ষা করাই বিবেচনার কাজ। লুংচু হোমস্টে-তে শাক সব্জির জোগাড় নিজের বাগান থেকেই আসে। তার অন্য স্বাদ। আমরা যখন পথে ছিলুম, আমার কাছে ফোন আসে। সরাইয়ের কর্ত্রী আমাদের চালককে অনুরোধ করেন ওদলাবাড়ির একটি বিশেষ দোকান থেকে যেন কুক্কুটমাংস সংগ্রহ করে নেন। বুঝলুম তারা আমাদের সেবনের জন্যই বলিপ্রদত্ত হয়েছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু চোখ লেগে গিয়েছিলো। শীত শীত লাগতে ঘুম ভেঙে গেলো। বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই গায়ের উপর দিয়ে ঘরে মেঘ আনাগোনা করতে লাগলো। দূরে তাকালে ঘন শীতল বাষ্পের অভিরাম মায়াবী স্পর্শ।

দেশে অনেক পয়সা-উসুল পাবলিক আছেন। যাঁদের দাবি, সুন্দরবন গেলেই সারি সারি বাংলার বাঘ যেন গার্ড অফ অনার দিতে দাঁড়িয়ে থাকে। অথবা খরচা করে পাহাড় গেলেই ম্যাডাম কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন ঘোমটা সরিয়ে ড্যান্স ভিডিওর সুন্দরীদের মতো নিজেকে প্রকট করে যান। আরও ভয়ানক আরেক দল আছেন। যাঁদের উত্তরে গেলেই 'বরফ, বরফ' বিপন্ন আকুলতা । আবার সাগরে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা নোনা জলে লম্ফ দিয়ে রোদ সেঁকে যাওয়া। ট্রফিসুন্দরী বউয়ের মতো ফুল প্যয়সাবসুল ভেকেশনিং না হলে কী করে চলবে? খুব মায়া হয় তাঁদের জন্য। লুংচুতে যেখানে ছিলুম সেখানে 'শুয়ে শুয়ে' জানালা দিয়ে নাকি তাঁকে দেখা যায়। আমরা দেখিনি। কিন্তু যা দেখেছি, এক কথায় 'মাটির ওই কলস আমার ছাপিয়ে গেলো কোন ক্ষণে। .'

এতো দূর পর্যন্ত এসে মনে হয় অক্ষরকে বিদায় দিই। এবার চোখের পালা। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। আমরাও খেলা খেলেছিলেম।

এবার আপনাদের পালা,




Lungchu, Kalimpong
Shibanshu


Lungchu, Kalimpong
Shibanshu


Lungchu, Kalimpong
Shibanshu


@Lungchu Homestay, Kalimpong




Lungchu, Kalimpong
Shibanshu


Shibanshu


Lungchu, Kalimpong
Shibanshu


Lungchu, Kalimpong
Shibanshu



Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 1w
নয়ন সার্থক হল ছবিগুলো দেখে। আর যাত্রাপথের বর্ণনা মনকে সার্থক করল। ভালোই লাগল খেলাটা। ভ্রমণ ভ্রমণ খেলা।

Reply Share

Gunjan G Traveler · 1w
রোমাঞ্চকর অভিযাত্রার অসাধারণ, রসাত্মক এই লেখাটি পড়ে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। এত প্রাণবন্ত বর্ণনা যে, যেন প্রতিটি মুহূর্ত চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। ছবিগুলোও অপূর্ব—আপনার তোলা ছবির সেই স্বতন্ত্র ট্রেডমার্ক যেন প্রতিবারের মতোই মন ছুঁয়ে গেল। এমন সুন্দর লেখা ও মনোমুগ্ধকর আলোকচিত্র আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ।

Reply Share

Alak Basuchoudhury · 1w
আহা রে, লেখাটির কী বাহার -
তেমনি সব ছবি সঙ্গে তাহার!
এক কথায় এ যে অনির্বচনীয় --
এরকম আরো মাঝে মাঝে দিও।

Reply Share Edited

সুচিপত্র

ব্যাপ্ত হোক জীবনের জয় ....



Shibanshu De

শিবাংশু দে

ব্যাপ্ত হোক জীবনের জয় ....

অনন্ত পদ্মনাভন ছিলেন মগধে কলিঙ্গদেশের রাজা। কলিঙ্গদেশ' মানে উৎকল দেশের দক্ষিণে, অন্ধ্রদেশের উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ছোটো রাজ্য। মৌর্য বংশের সিংহাসনে বিন্দুসারপুত্র অশোক আরোহণ করার পর থেকেই তাঁর সাধ ছিলো ভারতবর্ষের দক্ষিণে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রসার হোক। শুধু অশোক ন'ন। তাঁর পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং পিতা বিন্দুসার দুজনেরই ইচ্ছে ছিলো কলিঙ্গবিজয়। যেহেতু দক্ষিণাপথের দুয়ার ছিলো কলিঙ্গদেশ। মৌর্য রাজত্ব এবং অশোকের ইচ্ছা জানার পরেও কলিঙ্গের রাজা আমল দেননি। তাঁদের নিজস্ব বীর্যগরিমার অহংকার ছিলো। ফলে একটি যুদ্ধ হলো। অশোকের সিংহাসন আরোহণের ঠিক আট বছর পরে।

অশোকের সঠিক জন্মসময়, সিংহাসন অভিষেকের কাল বা কলিঙ্গ যুদ্ধের তারিখ, কোনও কিছু নিয়েই কোনও স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। শিলালিপিতে শুধু পাওয়া গেছে ওই 'আট বছর' তথ্যটি। একটি অনুমান, যুদ্ধ হয়েছিলো দুশো একষট্টি সাল খ্রিস্টপূর্ব। কিংবদন্তি বলে এক লক্ষ দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিলো সেই যুদ্ধে । দয়ানদীর দক্ষিণে ধওলি পাহাড়ের অববাহিকায় ঘটেছিলো সেই মহাসমর। মৃত সৈনিকদের রক্তে দয়ানদীর জল লাল হয়ে গিয়েছিলো। এসবই অতিকথন। সেকালে যুদ্ধে এক লক্ষ দশ হাজার সৈনিকের মৃত্যু, ঠিক গ্রহণযোগ্য তথ্য নয়।

তবে এদেশের ইতিহাসে এই যুদ্ধ একটি মাইলফলক। রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের কাহিনি বা 'ইতিহাস' কতোটা 'ঘটনা' বা কবির মনের মাধুরী, তা এখনও জানা যায়নি। তবে ধওলির যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অশোক প্রতিষ্ঠিত অগণন শিলালিপির সূত্রে তার যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে ঘটনাগুলির প্রামাণ্য সূত্র রয়েছে, তারা হলো, রাজা অনন্ত পদ্মনাভের মৌর্য সম্রাটের প্রতি প্রত্যাখ্যান অশোক'কে রুষ্ট করে। তিনি স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়ে মগধের সুবিশাল সেনাবাহিনীকে কলিঙ্গদেশে নিয়ে আসেন। একমাত্র এই যুদ্ধটিতেই সম্রাট অশোক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ধওলি পাহাড় থেকে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো, তা সমগ্র

কলিঙ্গ সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে ছিলো। লাখ-দুলাখের হিসেব না করেও বলা যায়, দুপক্ষেরই অসংখ্য মানুষ কালগতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কলিঙ্গ রাজ্যের অসংখ্য প্রজা, নরনারী নির্বিশেষে, দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ন বা বন্দী হয়ে দাসবৃত্তির শিকার হ'ন । এই জয়লাভ অশোকের জন্য দক্ষিণাপথের দরজা খুলে দিয়েছিলো। কিন্তু যে মূল্যে সেই প্রাপ্তি, তার অভিঘাত অশোককে অভিভূত করে দেয়। কুরুক্ষেত্র কতোটা 'ধর্মক্ষেত্র' ছিলো সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে 'ধওলিক্ষেত্র' এদেশের ইতিহাসে নিঃসংশয়ে 'ধর্মক্ষেত্র'-এর স্বীকৃতি পেতে পারে। যে নৈতিক শক্তি থেকে এককালে ভারতবর্ষ সারা বিশ্বকে আলো দেখিয়ে ছিলো, যার বলে 'চণ্ডাশোক' কুখ্যাতি জয় করে এক সম্রাট দেবানাং প্রিয়, প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক হয়ে উঠেছিলেন, তার ভিত্তি রচনা করেছিলো ধওলির প্রান্তর।

কিংবদন্তি বলে, যুদ্ধশেষে সন্ধ্যার আঁধারে অশোক যখন ক্ষেত্র পরিদর্শন করছিলেন, তখন এক শোকাকুলা নারী তাঁর কাছে একটি প্রার্থনা করেন। এই যুদ্ধে সেই নারীর পিতা, স্বামী এবং পুত্র, সবার মৃত্যু হয়েছে। অতএব সম্রাট যেন অনুগ্রহ করে তাঁকেও প্রাণদণ্ড দেবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রার্থনা সম্রাটকে ভিতর থেকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলো। তিনি রাত্রিবেলা একাকী দয়ানদীর তীরে, শোকজর্জর চিত্তে বিষন্ন বসে ছিলেন। এই সময় একজন বৌদ্ধ শ্রমণ তাঁর পাশে বসে 'ধম্মপদ' থেকে অহিংসার মর্মবাণী আবৃত্তি করে শোনান। সম্রাট সম্ভবত তখন সেই শুশ্রূষারই সন্ধান করছিলেন। বাকিটা ইতিহাস। এই যুদ্ধের পর, বলা হয়, প্রিয়দর্শী অশোক বলপ্রয়োগ করে কোনো যুদ্ধ করেননি। তাঁর পন্থা ছিলো 'ধম্মবিজয়'। দিকে দিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল প্রেরণ করে তিনি সদ্ধর্মের প্রচার শুরু করেন। বুদ্ধের বাণীর প্রভাবে বহু রাজত্বের অধিপতিরা হিংসা পরিহার করে প্রিয়দর্শীর পথ অবলম্বন করেছিলেন।

এক ইস্টারের ভোরবেলা আমরা শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধকে স্মরণ করে ধওলি পাহাড় যাত্রা করেছিলুম। বহুবারই গিয়েছি আগে পরে। তবে সেদিন ছিলো খ্রিস্টের দিন। আমরা গিয়েছিলুম খ্রিস্টের গুরু'র আশ্রয়ে। যে 'শান্তিস্তূপ'টি নিপ্পনভক্তরা স্থাপন করেছিলেন ধবলগিরি বা 'ধওলি'তে, সেখানেই রওনা দিয়েছিলুম কিছুক্ষণ বসার জন্য। কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা। শব্দহীন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাওয়া সেই মানুষদের, যাঁদের দৌলতে পৃথিবী এতো হিংস্র অপহ্নবের শিকার হবার পরেও মানুষের বাসযোগ্য হয়ে রয়ে যেতে পেরেছে।

শহর থেকে একটু দূর, নদী পেরিয়ে অনুচ্চ পাহাড়টির কাছে যাওয়া। ভোরসকালে গাড়ির ভিড় থাকেনা। যতোটা উপরে যাওয়া যায়, ততোদূর গাড়ি পৌঁছে যায় অনায়াস। ভোরের আলোয় সেই শাদা বিরাট স্তূপটির পিছনে যখন সূর্য একটু একটু করে বেড়ে ওঠে, পশ্চিমমুখী মূল প্রবেশ থেকে তাকে খুব বিনম্র

মনে হয়। এই টিলাটি এককালে পিয়দস্সি অশোকের প্রিয় ভূমি ছিলো। দয়ানদীর পারে এই পাহাড়টির ভিত্তিভূমিতে অশোক স্থাপন করেছিলেন তাঁর দণ্ডনীতির বিশদ শিলালিপি। কিংবদন্তি বলছে এই প্রান্তরেই কুখ্যাত কলিঙ্গযুদ্ধের রক্তস্নান দেখে চণ্ডাশোকের ধর্মাশোক হয়ে ওঠা। যদিও এসবের কতোটা কাহিনি , কতোটা ইতিহাস, বলা যায়না, তবু এর স্থানমাহাত্ম্য অস্বীকার করার মতো নয়। প্রামাণ্য বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রাচীন ধওলি রাজ্য ও তার প্রভাবের ইতিবৃত্ত অনেক সূত্রেই দেখতে পাই আমরা ।

১৯৭২ সালে জাপান বুদ্ধ সঙ্ঘ এবং কলিঙ্গ-নিপ্পন বুদ্ধ সঙ্ঘের মিলিত প্রয়াসে, জাপানের নিচিরেন বৌদ্ধগোষ্ঠীর নিপ্পনজেন মিয়োহোজি মঠের প্রধান ভিক্ষুর তত্ত্বাবধানে এই স্তূপটির স্থাপনা হয়। নাম দেওয়া হয় 'শান্তিস্তূপ'। অগণ্য শ্রেষ্ঠ মন্দিরের দেশ, ওড়িশা ও ভুবনেশ্বরের গরিমা মনে রেখেও এই স্তূপটি বিশালত্ব ও গাম্ভীর্যে মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য স্বতোৎসার আকর্ষণ করে চলেছে। এর চারপ্রান্তে বুদ্ধের বাল্যমুদ্রা, ভূমিস্পর্শমুদ্রা, ধর্মচক্রপ্রবর্তনমুদ্রা এবং মহাপরিনির্বাণের অনুপম মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বাস রিলিফ প্যানেলে বুদ্ধের জীবনকালের ধারাবিবরণী এবং কলিঙ্গ ইতিহাসে বৌদ্ধ সভ্যতার ইতিবৃত্তও দেখা যায়। ওড়িশার দিগগজ ভাস্করদের যোগদানে এই সব কলাকৃতি যে আধুনিক ভারতের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের একটা পর্যায় হয়ে উঠতে পেরেছে, সেটা নিশ্চিত। শৈলি বিচার করলে এই সব ভাস্কর্য দেশের দুই শ্রেষ্ঠ ঘরানা, কলিঙ্গ ও মথুরা'র মিশ্রণ।

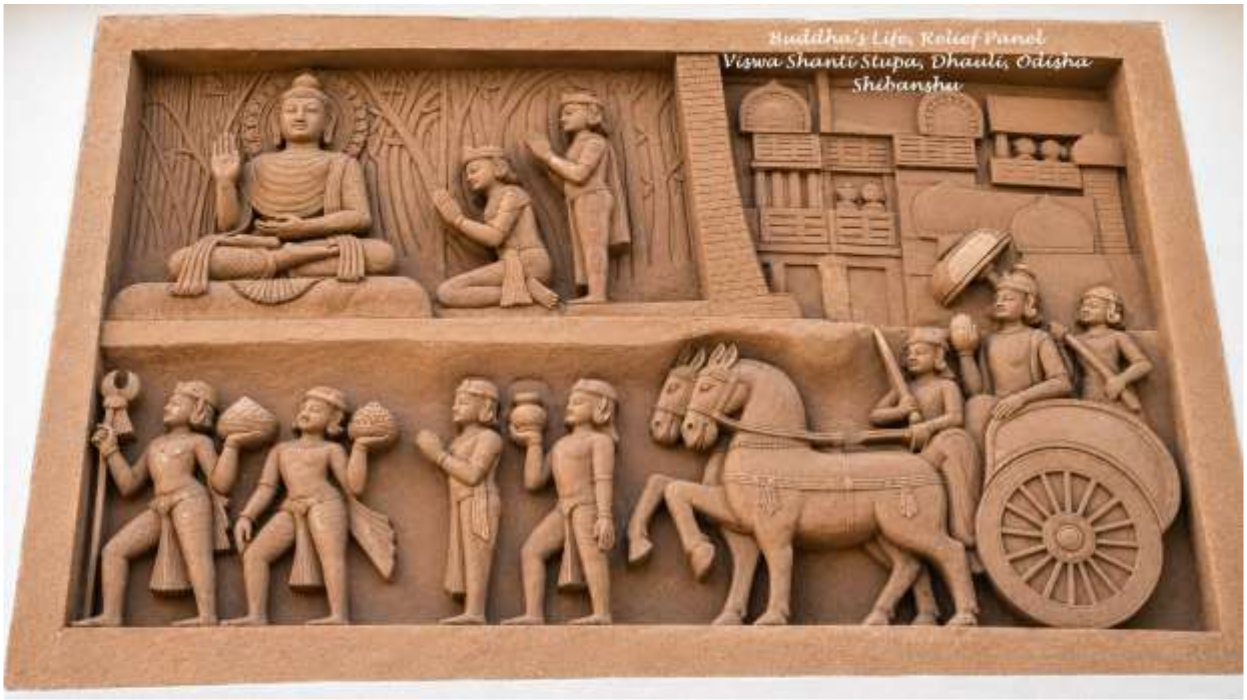
সচরাচর পুরী যাবার পথে ব্যস্ত পর্যটকের দল ত্বরিত যাত্রাভঙ্গ করে এই স্তূপটি দেখতে আসেন। কিন্তু শুধুমাত্র পর্যটক আকর্ষণ নয়, এর কাছে চাইলে আরো অনেক কিছু পাওয়ার আছে। এই অর্বাচীন নির্মাণটির হয়তো অনুরাধাপুরা বা সারনাথের মতো কোনও গরিমাময় ইতিহাস নেই ; কিন্তু এই ঠিকানায় দুদণ্ড শান্তিতে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো মৌন অবকাশ দেশের খুব কম দেবস্থানেই পাওয়ার সুযোগ হয় । ঐ উঁচু পাহাড়ের শিখর থেকে দেখা দয়ানদী, আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর, ভাসানো হাওয়ার প্লাবন, নীলাচলের দিকচিহ্ন ঘেরা অপার চরাচর , আমাদের দশ ফুট বাই দশফুট পৃথিবীর গারদখানার শিকল থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও, মুক্তি দেয়। সব সাধনই তো বাঁধন ছেঁড়ার। কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী হওয়ার ক্ষণিক আনন্দ কখনও কখনও হরিপদ কেরানিরও নসিব হয়ে যায়, এইভাবে।


Viswa Shanti Stupa
Dhali, Odisha
Shibanshu


River Daya, from Viswa Shanti Stupa,
Dhauli, Odisha
Shibanshu

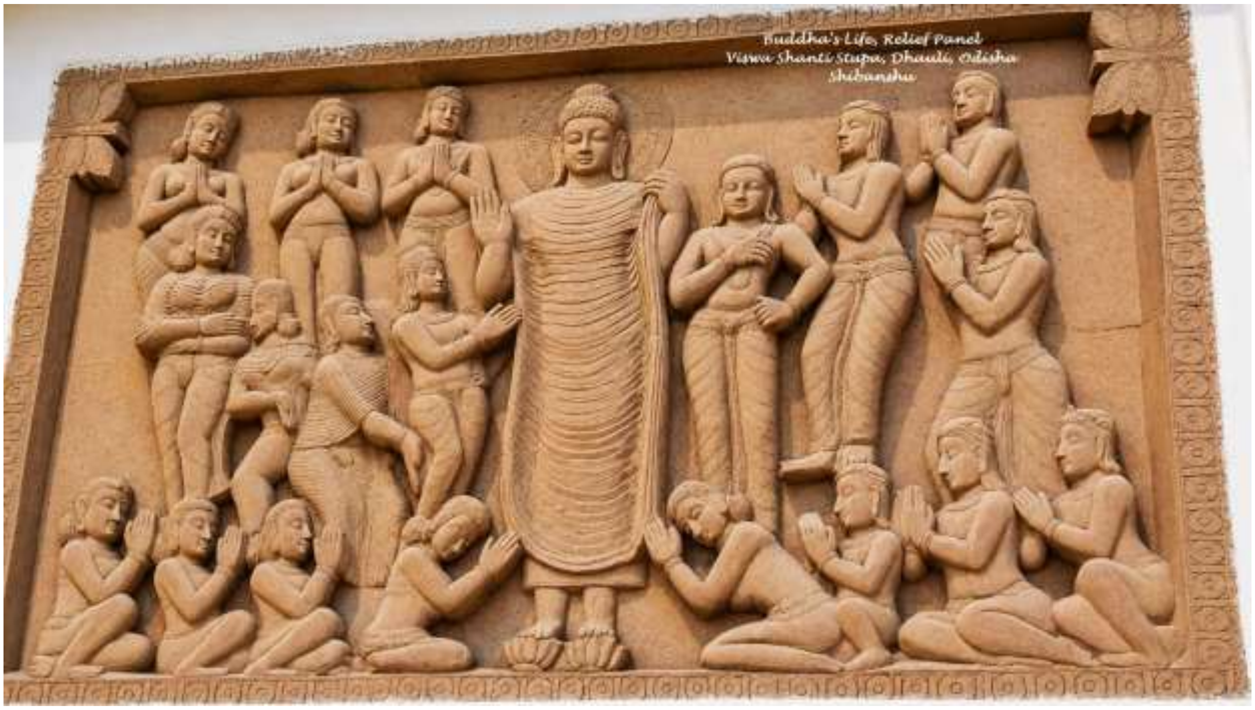

Buddha @Balya Mudra
Viswa Shanti Stupa, Dhauli, Odisha
Shibanshu


Buddha @Kalachakra Mudra
Viswa Shanti Stupa, Dhauli, Odisha
Shibanshu


Buddha's Life, Relief Panel
Viswa Shanti Stupa, Dhauli, Odisha
Shibanshu


Buddha's Life, Relief Panel
Viswa Shanti Stupa, Dhauli, Odisha
Shibanshu


Buddha @Bhoomisparsha Mudra
Viswa Shanti Stupa, Dhauli, Odisha
Shibanshu


Buddha's Life, Relief Panel
Viswa Shanti Stupa, Dhauli, Odisha
Shibanshu


From Viswa Shanti Stupa,
Dhauli, Odisha
Shibanshu


From Viswa Shanti Stupa,
Dhauli, Odisha
Shibanshu


The Kalinga War Field
From Viswa Shanti Stupa,
Dhauli, Odisha
Shibanshu

Selected Comments

Jayati Sen · 3d
অনেক কিছু জানতে পারলাম আপনার তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পড়ে,দেখার আগ্রহ হচ্ছে। উড়িষ্যা এখন পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 2d
সুন্দর এক ইতিহাস তুলে ধরলেন গল্পের মাধ্যমে। আপনার লেখা পড়তে পড়তে হারিয়ে যাই অতীতে। সঙ্গের ছবিগুলো এক বিশেষ প্রাপ্তি।

Reply Share

Gunjan G Traveler · 3d
তথ্যসমৃদ্ধ আপনার অপূর্ব লেখনী পড়ে প্রতিবারই নিজেকে সমৃদ্ধ মনে হয়। এক-এক সময় ভাবি, আপনি কত না জায়গায় ঘুরেছেন! কত অমূল্য অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভাণ্ডার আপনার কাছে সঞ্চিত রয়েছে। প্রায় ১২ বছর ধরে আপনার লেখা পড়ে আসছি, কিন্তু এখনও মন ভরে না—বরং আরও পড়ার ইচ্ছে জাগে। তার সঙ্গে আপনার তোলা অনবদ্য ছবিগুলো লেখাকে যেন আরও জীবন্ত করে তোলে। সত্যিই, আপনার লেখনী এককথায় অনন্য। আরও অনেক সুন্দর লেখা ও ছবির অপেক্ষায়।

Reply Share

Brihot Bongo · 2d
চমৎকার লেখা! ভ্রমণ স্মৃতি মনে পড়িয়ে দিল!

Reply Share

সুচিপত্র

খিদিরপুর জগন্নাথ মন্দির

সুব্রত ঘোষ



Subrata Ghosh

খিদিরপুর জগন্নাথ মন্দির

আজ ২০২৬ সালের রথযাত্রা। সারাদিন ধরে প্রভু জগন্নাথদেবকে নানা ভাবে স্মরণ করার বিশেষ দিন। এই দিনে আজ একটু ঘুরে দেখা যাক, কলকাতায় তাঁরই একটি বিশেষ মন্দির।

জগন্নাথদেবের সবচাইতে বিখ্যাত মন্দির ওড়িশার পুরীতে হলেও, বাঙালির কাছে প্রভু জগন্নাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দেবতা। তাই, বাংলায় মাহেশ থেকে শুরু করে বহু জায়গাতেই তাঁর অনেক মন্দির দেখা যায়। কলকাতা শহরেও নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর অনেক মন্দির। তারই মধ্যে অন্যতম প্রধান হল খিদিরপুরের জগন্নাথ মন্দির, যেটির পূজা অর্চনা ও অন্যান্য সব অনুষ্ঠানই হয় মোটামুটি পুরীর মন্দিরের নিয়মানুসারে। তাই অনেকের কাছেই এর মাহাত্ম্য ও আকর্ষণ আলাদা।

খিদিরপুর রোডের বড় রাস্তা থেকে ট্রাম ডিপোর কাছে একটি ছোট রাস্তায় (Dock East Boundary Road) একটু গেলেই দেখা মেলে এই মন্দিরের। এটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি - একটি ছোট মন্দিরের মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে মন্দিরটির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি বাড়তে থাকে, এবং কালক্রমে এই বড় মন্দিরটি এখানে তৈরি করা হয়। ২০০৩ সালে এখানে নতুন বড় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, পুরী থেকে বিশেষ পূজারীরা এসে বিশেষ অভিষেকের মধ্যে দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করেন। মন্দিরের স্থাপত্যে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কিছুটা ছাপ আছে, যদিও অবশ্যই তা অনেক ছোট পরিসরে। মন্দিরে ঢোকার মুখে ঠিক বাইরেই মা বটমঙ্গলা মন্দির। ওড়িশায় বটমঙ্গলা মন্দিরের অবস্থান ভুবনেশ্বর - পুরী হাইওয়ের ওপরে, পুরী থেকে সাত কিলোমিটার মতো দূরে। লোকবিশ্বাস মতে, পুরীর মূল মন্দিরে যাওয়ার আগে ওখানকার বটমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেওয়া বিধেয়, তিনিই ভক্তকে পুরীর মন্দিরের পথনির্দেশ দেন। খিদিরপুরের মন্দিরের ভেতরে তাই প্রভু জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের পাশাপাশি আরো অনেক দেবতার ছোট ছোট মন্দির থাকলেও, এই বটমঙ্গলা দেবীর মন্দির কিন্তু আছে মূল মন্দির চত্বরের বাইরে, প্রবেশপথের ঠিক আগেই, যাতে প্রভুকে দর্শন করার আগে ভক্তরা বটমঙ্গলা দেবীকে দর্শন ও প্রণাম করে, তবে মন্দিরে প্রবেশ করেন।

এরপর মন্দিরে প্রবেশ। প্রবেশ পথের দুদিকে দুটি সিংহের মূর্তি, প্রবেশদ্বারকে তাই বলা হয় সিংহদ্বার। ঢুকেই সামনেই একটি প্রশস্ত চত্বর, সেখানেই আছে অরুণ স্তম্ভ। অরুণ স্তম্ভের নিচে খোদিত আছে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, সেই সঙ্গে আরো কিছু মূর্তি। চত্বরের একদিকে আছে সুসজ্জিত যজ্ঞস্থল, প্রসাদ বা ভোগ বিতরণের স্থান, আর অন্যদিকে পূজা সামগ্রীর দোকান আর ওঁদের অফিস। মূল মন্দির দোতলায়। দুপাশ দিয়েই সিঁড়ি উঠে গেছে, সেই সিঁড়ির আঠারোটি ধাপ পেরিয়ে প্রথমে পৌঁছে যাওয়া যায় আর একটি স্তম্ভ - গরুড় স্তম্ভের কাছে। (উল্লেখ্য - পুরীর মন্দিরের সামনেও আছে অরুণ স্তম্ভ আর নাটমন্দিরের ভেতরে আছে গরুড় স্তম্ভ)। এখানে গরুড় স্তম্ভ থেকে আরো চার ধাপ উঠে, অর্থাৎ একতলা থেকে মোট বাইশটি সিঁড়ি পেরিয়ে, পৌঁছে যাওয়া যায় মূল মন্দিরে। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, যেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে দেবদর্শন করা যায়, তারপরে আবার একটি ছোট লম্বা অংশ, অনেকটা কোন মন্দিরের নাটমন্দিরের মতো, আর তারপরেই গর্ভগৃহে উঁচু রত্নবেদীর ওপর একসঙ্গে ত্রিমূর্তি অর্থাৎ জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের অধিষ্ঠান। সামনে বেশ কাছ থেকেই সুন্দর করে দর্শন করা যায়। খুব বেশি ভিড় থাকেনা, যদিও কোন কোন দিন বা বিশেষ উৎসব বা পুজোর দিনে ভালোই ভিড় হয় । এখানে মূল দেবতা জগন্নাথদেব, এবং সেইসঙ্গে সুভদ্রা মাতা ও বলরামদেব। আগেই বলেছি, মূল মন্দিরটি ছোটর মধ্যেই কিছুটা পুরীর মন্দিরের ধাঁচে তৈরি, বাইরে ছাদের প্রশস্ত এলাকা থেকে মন্দিরের সেই স্থাপত্য ও তিনটি চূড়ো ভালো করে বোঝা যায়। মূল মন্দিরের গায়ে অনেক দেবতার মূর্তি ও অলঙ্করণ খোদিত, তার মধ্যে আছে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি। এছাড়া, মূল মন্দিরকে ঘিরে চারপাশে আছে আরো ছোট ছোট কিছু মন্দির - শ্রী গণেশ, মা সরস্বতী, মহাবীর হনুমান, সূর্য নারায়ণ, মা বিমলা, মা লক্ষ্মী, ভাগবত এবং প্রভু শিবের মন্দির। প্রত্যেকটি মন্দিরের পরিচয় লেখা আছে ওড়িয়া,ইংরিজি, হিন্দি, আর বাংলায়, এখানেও সেই ওড়িশার প্রভাব। আর এসবই আছে ওপরের খোলা ছাদে, সেখানে খোলা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে সব মন্দিরই পরিক্রমা হয়ে যায়। এর মধ্যে ভাগবত মন্দিরে আবার আলাদা করে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের অধিষ্ঠান। খোলা ছাদ থেকে বাইরে যেমন একদিকে দেখা যায় দূরের রেললাইন, তেমনই অন্যদিকে এই সব ছোট ছোট মন্দির। সব মিলিয়ে ভারী সুন্দর পরিবেশ । আমি গিয়েছিলাম সন্ধ্যের পরে, তাই মন্দিরগুলির ছবি ভাল করে তোলা না গেলেও দেখেছি প্রভুর অপরূপ সান্ধ্য আরতি। ওই সুন্দর পরিবেশে, উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ, কাঁসর ও ঘণ্টার আওয়াজ আর সামনে জগন্নাথদেবের দর্শনে মনে আপনা থেকেই একটা ভাল লাগা তৈরি হয়ে যায়, মনে হয়, সাধারণ দর্শনের পাশাপাশি এই আরতি দর্শনের মধ্যে দিয়ে এখানে আসাটা যেন একটা বাড়তি মাত্রা পেয়ে গেল, এটি একটি বিশেষ প্রাপ্তি।

সন্ধ্যা আরতির পর আবার নিচে গিয়ে একটু প্রসাদ পাওয়া । আমি যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন একেবারেই ভিড় ছিল না। তাই দেবদর্শন, আরতি দর্শন এবং প্রসাদ পাওয়া - কোথাওই কোন অসুবিধে হয়নি। যেদিন ভিড় থাকে, সেদিন স্বাভাবিকভাবেই হয়তো একটু লাইন হতে পারে, কিন্তু এঁদের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবহার বেশ ভাল এবং আন্তরিক । ছবি তোলায় কোন বাধা নেই, তবে ধর্মস্থানের পবিত্রতা ও পরিবেশ নিজেদের দিক থেকেই বজায় রাখা ভাল। সব দিক দিয়েই, কলকাতার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের এই মন্দির সব ধরণের মানুষ বা বিশেষ করে জগন্নাথপ্রেমী মানুষদের কাছে একটি আলাদা ভালো লাগার ঠিকানা।

ছবি - ১ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রী শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলারাম ।



ছবি - ২ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে সান্ধ্য আরতি।



ছবি - ৩ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রবেশপথের ঠিক বাইরেই মা বটমঙ্গলার মন্দির।



ছবি - ৪ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রবেশপথের ঠিক বাইরেই মা বটমঙ্গলার মন্দিরের মূর্তি ।



ছবি - ৫ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেই সামনে এই অরুণস্তম্ভ।



ছবি - ৬ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেই সামনের অরুণস্তম্ভের বেদীতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ।



ছবি - ৭ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে একতলায় একদিকে এই যজ্ঞস্থল।



ছবি - ৮ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে একতলায় অন্যদিকে পূজা সামগ্রী কেনার দোকান ও মন্দিরের অফিসঘর।



ছবি - ৯ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি । দূরে দেখা যাচ্ছে গরুড়স্তম্ভ ।



ছবি - ১০ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে দোতলায় মন্দিরের সামনেই গরুড়স্তম্ভ ।



ছবি - ১১ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরে দোতলায় গরুড়স্তম্ভের সামনে চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে মূল মন্দির ।



ছবি - ১২ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের দোতলায় মূল মন্দির গৃহ।



ছবি - ১৩ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে।



ছবি - ১৪ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের ওপরের খিলানে বিষ্ণুর অনন্তশয্যার মূর্তি।



ছবি - ১৫ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে। একদম বাঁ দিকে বলরামদেব আড়ালে পরে গেছেন।



ছবি - ১৬ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরের ভেতরের ছাদ ।



ছবি - ১৭ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দির - বাইরের ছাদ থেকে।



ছবি - ১৮ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের চুড়ো- বাইরের ছাদ থেকে।



ছবি - ১৯ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দির - বাইরের ছাদ থেকে



ছবি - ২০ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের গায়ের কারুকাজ।



ছবি - ২১ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের গায়ে দশাবতারের মূর্তি ।



ছবি - ২২ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের গায়ে দশাবতারের মূর্তি - নৃসিংহ অবতার, মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, বরাহ অবতার।



ছবি - ২৩ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে।

এটি গনেশ মন্দির।



ছবি - ২৪ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে।

এটি সরস্বতী মন্দির।



ছবি - ২৫ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে। এখানে দু জায়গায় দুটি হনুমানজীর মন্দির।



ছবি - ২৬ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে। এটি সূর্য মন্দির।



ছবি - ২৭ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে। এটি মা বিমলার মন্দির।



ছবি - ২৮ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে। এটি মা লক্ষ্মীর মন্দির।



ছবি - ২৯ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে। এটি ভাগবত মন্দির।



ছবি - ৩০ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে। এটি ভাগবত মন্দির। ভেতরে এখানেও জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরাম।



ছবি - ৩১ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বদেবতাদের ছোট ছোট মন্দির আছে। এটি শিব মন্দির।



ছবি - ৩২ / ৩২ - খিদিরপুরের জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে - দোতলার ছাদে ।



Selected Comments

Susmita Kumkum Bagchi · 1w
খুব সুন্দর এই মন্দিরটি। আমার একবার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল 🙏🙏
Reply Share

Ghosh Ruchismita · 1w
সত্যি এই জগন্নাথ মন্দিরের কথা জানা ছিল না। বিশদে সব জানিয়েছেন। সব ক'টি ছবি খুব সুন্দর। এখানেই দর্শন হয়ে গেল। অনেক ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ।🙏🙏🙏🙏🙏
Reply Share

Tirthankar Pramanick · 1w
এই মন্দির কি খিদিরপুর রেল স্টেশন এর কাছে?
Reply Share

Gunjan G Traveler · 1w
কলকাতার বুকে এমন একটি অপূর্ব জগন্নাথদেবের মন্দির রয়েছে—আপনি না লিখলে হয়তো জানাই হতো না। বরাবরের মতো এবারও আপনার তথ্যসমৃদ্ধ ও মনোগ্রাহী লেখনী, তার সঙ্গে অসাধারণ ছবি এবং ভিডিও—সব মিলিয়ে মনে হলো যেন মন্দিরটির চাক্ষুষ দর্শনই করে নিলাম।

এমন একটি অজানা ও মূল্যবান তথ্য আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আর প্রতিবারের মতো এত সুন্দর ছবি ও ভিডিও দিয়ে পোস্টকে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতেও আপনার এমন তথ্যবহুল ও নান্দনিক ভ্রমণপোস্টের অপেক্ষায় রইলাম।
Reply Share

Subrata Ghose · 1w
Gunjan G Traveler হ্যা, মন্দিরটি অনেকদিনের। এটি পুরীর মন্দিরের রীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ' ওখানকার নিয়মানুযায়ীই এখানে সব কিছু হয়। তবে, অনেকেই এটির কথা সেভাবে জানেনা - হয়তো কলকাতার এক প্রান্তে অবস্থিত বলে বা সেভাবে বিজ্ঞাপন নেই বলে। পরে আর একটি মন্দির নিয়েও লেখার ইচ্ছে আছে।
Reply Share

সুচিপত্র

নব্বই ফিট উঁচু জগন্নাথ মন্দির - নিউ টাউন।



Subrata Ghosh

সুব্রত ঘোষ

নব্বই ফিট উঁচু জগন্নাথ মন্দির - নিউ টাউন।

আজ ২০২৬ সালের উল্টোরথ। কয়েকদিন আগে, রথের দিনে, আমি কলকাতার খিদিরপুরের জগন্নাথ মন্দির নিয়ে একটি পোষ্ট করেছিলাম । আজ উল্টোরথের দিনে দিচ্ছি কলকাতার আর একটি জনপ্রিয় জগন্নাথ মন্দির - নিউটাউনের জগন্নাথ মন্দিরের কিছু ছবি।

কলকাতার নিউটাউনের action area 3এ, কারিগরি ভবনের কাছেই এই মন্দির। প্রায় ৯০ ফিট উঁচু, এই মন্দির, কিছুটা ওড়িয়া শৈলীতে নির্মিত। সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা, সেখানে আছে মন্দিরের দিকে মুখ করে একটি গরুড় স্তম্ভ, আর জলের ফোয়ারা। মন্দিরে ঢোকার চওড়া সিঁড়ির দুপাশে সিংহের মূর্তি, সেই সিঁড়ি পেরিয়ে এক প্রশস্ত নাটমন্দির। তার পরেই মূল গর্ভগৃহের মধ্যে জগন্নাথ দেব, সুভদ্রা দেবী ও বলরাম দেবের মূর্তি। তবে, এখানে প্রতিটি মূর্তিই আছে দুটি করে । একটি করে বড় মূর্তি, আর তাঁদের ঠিক নিচেই তাঁদেরই আর এক সেট ছোট মূর্তি। অর্থাৎ দুজন জগন্নাথ, দুজন সুভদ্রা, দুজন বলরাম। ত্রিমূর্তির দুই ধারে দুটি ছোট লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি। এ সবই আছে মূল গর্ভগৃহে। এই গর্ভগৃহের দুপাশে একই সঙ্গে দুটি আলাদা মন্দিরকক্ষ, বাঁ পাশের কক্ষে লাল রঙের শ্রীহনুমানজী আর ডানদিকের কক্ষে শ্বেতপাথরের রাম-লক্ষণ-সীতার মূর্তি, তাঁদের পায়ের কাছে একপাশে হনুমানজী তাঁদের বন্দনায় রত। অর্থাৎ, একই মন্দিরে, একই ছাদের তলায় শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গেই পূজিত হচ্ছেন রাম, সীতা, লক্ষণ ও হনুমানজী।

এবারে আসি মন্দিরটির বৈশিষ্ট্যের কথায়। আগেই বলেছি, এটি প্রায় ৯০ ফিট উঁচু, সেই হিসেবে এটি সম্ভবত কলকাতার উচ্চতম জগন্নাথ মন্দির। কিন্তু, উচ্চতা ছাড়াও এটির বৈশিষ্ট্য এর বাইরের আর ভেতরের দেওয়ালের কারুকার্যে। খিদিরপুরের মন্দিরটিতে এরকম প্রচুর মূর্তি ও কারুকাজের সম্ভার ছিল না, সেই মন্দিরটি ছিল যেন অনেক বেশি গাম্ভীর্যপূর্ণ। কিন্তু নিউটাউনের এই মন্দিরে সর্বত্র প্রচুর মূর্তি

আর তার সঙ্গে সবগুলিই ভীষণভাবে রঙিন। এখানে বাইরে মন্দিরের গায়ে আছে সমুদ্রমন্থন, শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচার, বিষ্ণুর দশাবতার, গৌর - নিতাই - এসবের পাশাপাশি আরো বিভিন্ন রকমের মূর্তি ও প্যানেল। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে বলতে হয় মন্দিরের মাঝামাঝি অনেক উঁচুতে সমুদ্রমন্থনের সময়ে মন্দারপর্বতের চূড়ায় শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনের মূর্তি। তবে, এখানে কৃষ্ণের মুখের জায়গায় প্রভু জগন্নাথের মুখ - অর্থাৎ জগন্নাথদেব স্বয়ং যেন এখানে বাঁশি বাজাচ্ছেন। সেটি একটি দেখার মতো মূর্তি। বাইরের এরকম অজস্র মূর্তির পাশাপাশি ভেতরেও নানা জায়গায় বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। জগন্নাথদেবের গর্ভগৃহের মাথায় নৃসিংহ দেবের মূর্তি, রাম সীতা মূর্তির ওপরে রামের হরধনু ভঙ্গের মূর্তি, আর হনুমানজীর মন্দিরের ওপরে পঞ্চমুখী হনুমানের মূর্তি। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় আরো আছে নারায়ণ, লক্ষ্মী, গণেশ, রামসীতা, জাম্বুবান - প্রমুখের মূর্তি । বাইরেই হোক বা ভেতরে - সমস্ত মুর্তিগুলিই ভীষণভাবে রঙিন ও উজ্জ্বল। দেখে মনে হয়, ঝুলনের সময়ে যেমন নানা জায়গায় নানান মূর্তি ও পুতুল সাজানো হয়, এখানেও যেন পুরো মন্দির জুড়েই তেমনই একটা স্থায়ী ঝুলন সাজানো রয়েছে।

মন্দির খোলা থাকে মোটামুটি সকাল ৬টা থেকে সাড়ে বারোটা আর বিকেলে ও সন্ধ্যায় ৪টে থেকে রাত সাড়ে আটটা অবধি। তবে, সকালের চাইতে সন্ধ্যাবেলায় এই মন্দিরের রূপ আলাদা। সন্ধ্যায় পুরো মন্দির নানা রঙের আলোয় মোহময় সাজে সেজে ওঠে, সেই আলোয় দেওয়ালের সব মুর্তিগুলি যেন একবারে ঝলমলিয়ে ওঠে। সামনের ফোয়ারার জলে নানা রঙের আলোর খেলা চলে, সেই আলোতে আর রঙে পুরো মন্দির যেন রূপকথার এক স্থাপত্যের মতো লাগে। আলোকিত এই সৌন্দর্য কিন্তু সকালে গেলে পাওয়া যায় না।

আমার এই পোষ্টে চেষ্টা করেছি মন্দিরের এই বৈশিষ্ট্য আর সন্ধ্যেবেলার আরতি ও কীর্তন - কয়েকটি ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরতে। মন্দিরটির বিপরীতেই আছে আরো তিনটি মন্দির - রাধাকৃষ্ণ মন্দির, কালী মন্দির ও বনবিবির মন্দির। কিন্তু আজ আর তাদের ছবি দিলাম না, সেগুলি নিয়ে বলব কয়েকদিনের মধ্যেই আর একটি পোস্টে। তার আগে আজ শুধুই - “ জয় জগন্নাথ “ ।

ছবি ১ / ২৬ - মূল গর্ভগৃহের মধ্যে জগন্নাথ দেব, সুভদ্রা দেবী ও বলরাম দেবের মূর্তি। তবে, এখানে প্রতিটি মূর্তিই আছে দুটি করে । একটি করে বড় মূর্তি, আর তাঁদের ঠিক নিচেই তাঁদেরই আর এক সেট ছোট মূর্তি। অর্থাৎ দুজন জগন্নাথ, দুজন সুভদ্রা, দুজন বলরাম।



ছবি ২ / ২৬ - সান্ধ্য পুজা।



ছবি ৩ / ২৬ - গেটের মুখ থেকে। ডানদিকে গরুড় স্তম্ভ।



ছবি ৪ / ২৬ - সামনে আলোকিত ফোয়ারা ।



ছবি ৫ / ২৬ - সান্ধ্য আলোকসজ্জা।



ছবি ৬ / ২৬ - মন্দিরের বাইরে ওপরের দিকে সমুদ্রমন্থনের চিত্র। ওপরে জগন্নাথদেব



ছবি ৭/ ২৬ - মন্দিরের বাইরে ওপরের দিকে সমুদ্রমন্থনের চিত্র। ওপরে জগন্নাথদেব



ছবি ৮ / ২৬ - একটি কক্ষে শ্বেতপাথরের রাম-লক্ষণ-সীতার মূর্তি, তাঁদের পায়ের কাছে একপাশে হনুমানজী তাঁদের বন্দনায় রত।



ছবি ৯ / ২৬ - একটি কক্ষে লাল রঙের শ্রীহনুমানজী



ছবি ১০ / ২৬ - জগন্নাথদেবের গর্ভগৃহের মাথায় নৃসিংহ দেবের মূর্তি



ছবি ১১ / ২৬ - রাম সীতা মূর্তির ওপরে রামের হরধনুভঙ্গের মূর্তি



ছবি ১২ / ২৬ - হনুমানজীর মন্দিরের ওপরে পঞ্চমুখী হনুমানের মূর্তি



ছবি ১৩ / ২৬ - মন্দিরের ভেতরের স্থাপত্য ।



ছবি ১৪ / ২৬ - বাইরের দেওয়ালের ফ্রেস্কো ।



ছবি ১৫ / ২৬ - বাইরের দেওয়ালে।



ছবি ১৬ / ২৬ - দেওয়ালে রাম, লক্ষ্ সীতা ও হনুমানের মূর্তি ।



ছবি ১৭ / ২৬ - ভেতরের বিভিন্ন দেওয়ালে নারায়ণ, জাম্বুবান, নৃসিংহদেব ও গণেশের মূর্তি ।



ছবি ১৮ / ২৬ - বাইরের সিঁড়ির পাশে।



ছবি ১৯ / ২৬ - আলোকিত চূড়া



ছবি ২০ / ২৬ - মন্দিরের বাইরের আর এক দিক



ছবি ২১ / ২৬ - মন্দিরের দেওয়ালে দশাবতারের মূর্তির কয়েকজন ।



ছবি ২২ / ২৬ - মন্দিরের প্রাঙ্গণে গরুড়স্তম্ভ ।



ছবি ২৩ / ২৬ - সন্ধ্যায় কীর্তন



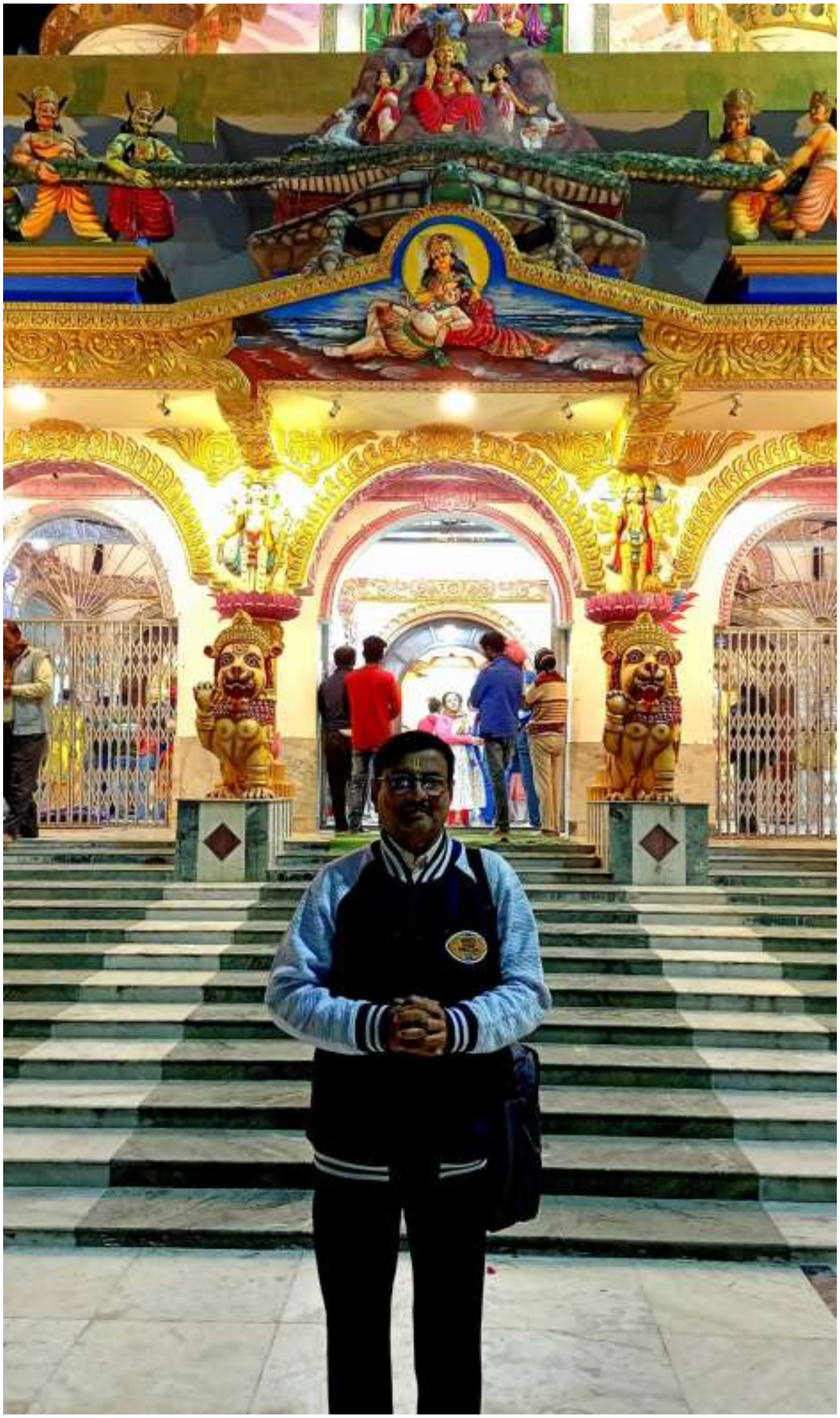
ছবি ২৪ / ২৬ - সন্ধ্যায় কীর্তন ও পরিক্রমা।



ছবি ২৫ / ২৬ - সান্ধ্য কীর্তন ।



ছবি ২৬ / ২৬ - মন্দিরের সামনে ।



Selected Comments

Gunjan G Traveler · 2d
আজ উল্টোরথের পুণ্যদিনে আপনার এই পোস্ট আমাদের গ্রুপকে যেন আরও পবিত্র ও সমৃদ্ধ করে তুলল। আপনার লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম ও নিখুঁত উপস্থাপনা, যা প্রতিটি লেখাকেই অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

কলকাতার বুকে প্রভু জগন্নাথের এমন কয়েকটি বিশাল ও দৃষ্টিনন্দন মন্দির রয়েছে, তা আগে জানা ছিল না। আপনার লেখার মাধ্যমেই সেই অজানা তথ্য জানতে পারলাম। সত্যিই দুঃখের বিষয়, এত সুন্দর মন্দিরগুলি এখনও যথাযথ প্রচার ও পরিচিতি পায়নি।

মন্দিরগুলির আলোকোজ্জ্বল, বর্ণময় ছবিগুলি আপনার ক্যামেরার ছোঁয়ায় যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বংশীবাদনরত প্রভু জগন্নাথের মূর্তিটি সত্যিই অনন্য ; অন্যান্য বিগ্রহগুলিও সমানভাবে মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়।
এমন তথ্যবহুল ও নান্দনিক পোস্টের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ।

Reply Share

Subrata Ghose · 1d
Gunjan G Traveler অনেক ধন্যবাদ। আমি এইভাবেই লেখার চেষ্টা করি সবসময় - আপনি তো জানেন। ওইদিকে আরো কিছু মন্দির আছে, চেষ্টা করব সেগুলোর বিষয়েও জানানোর ।

Reply Share

Brihot Bongo · 2d
খুব চমৎকার পোস্ট! বিশেষ করে ভালো লাগল প্রতিটি ছবির নিচে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচিতি দেওয়া হয়েছে বলে। এর আগে এই গ্রুপে একটি পোস্টে দেখেছিলাম পোস্টদাতার কোনও বক্তব্য বা বিষয় পরিচিতি ছিল না। শুধু 'মাধব মাধব' বা এই জাতীয় দুটি শব্দ লিখে কয়েকটি ছবি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল! এই পোস্টটিতে সেরকম কোনো ফাঁকিবাজি বা দায়সারা ভাব নেই দেখে ভালো লাগল।

Reply Share Edited

Subrata Ghose · 2d
Brihot Bongo ধন্যবাদ। আমি সব সময়ে এভাবেই পোস্ট করি - প্রতিটি ছবিতে সেটির স্পষ্ট পরিচিতি আর মূল পোষ্টের উল্লেখ করে। তাতে, ছবিটিকে কেউ আলাদা করে দেখলেও যাতে তাঁর বুঝতে অসুবিধে না হয়। এতে হয়তো পোষ্ট করতে একটু দেরী হয়, কিন্তু তবু এটাই আমার অভ্যাস। আপনি হয়তো আমার পুরনো পোষ্টগুলো দেখেননি, দেখলে বুঝতে পারতেন - সব পোষ্টেই আমি আমার নিজের এই নিয়মই অনুসরণ করি।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 2d
কী আশ্চর্য! এতদিন ধরে নিউটাউনের বাসিন্দা থেকেও এই মন্দিরের কথা জানতে পারিনি। আপনার পোস্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি ছবি, ভিডিও এবং বিশদ বর্ণনা দেখে ও পড়ে মনে হল যেন চাক্ষুষ করলাম। অনেক ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ। 🙏

Reply Share

Subrata Ghose · 1d
Ghosh Ruchismita ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অনেকেই জানে না - হয়তো একটু দূরে বা রিমোট অঞ্চলে বলেই। ওইদিকে আরো কিছু মন্দির আছে, চেষ্টা করব সেগুলোর বিষয়েও জানানোর ।

Reply Share

সুচিপত্র

নিউটাউনের জগন্নাথ মন্দিরের বিপরীতে আরো তিনটি মন্দির।



সুব্রত ঘোষ
Subrata Ghosh

নিউটাউনের জগন্নাথ মন্দিরের বিপরীতে আরো তিনটি মন্দির ।

কয়েকদিন আগে কলকাতার নিউটাউনের জগন্নাথ মন্দিরের কথা লিখেছি। তখনই জানিয়েছিলাম, যে ওখানে, ওই মন্দির চত্বরের ঠিক সামনেই আরো তিনটে মন্দির আছে। আজ বলব সেই মন্দিরগুলির কথা।

হাজরা কালী মন্দির –

ওই তিনটি মন্দিরের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মন্দির হল হাজরা কালী নামে এই মন্দিরটি। মন্দিরটি একাধারে শিব এবং কালীর - এটির গঠন এবং এর পিছনের লোকগাথা দুটোই একটু বিচিত্র। মন্দিরের ওপরে পাঁচটি চূড়ো, তবে আমাদের প্রচলিত পঞ্চারত্নের ধরণে নয়। পরপর পাঁচটি রঙ বেরঙের চূড়ো, একেবারে দুই কোণায় দুটি ছোট, তারপর দুটি মাঝারি, আর মাঝখানে একটি বড় চূড়ো, কোথাও যেন বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরের একটা খুব হালকা ছাপ। । চূড়োগুলিতে লাল, সবুজ, গোলাপী ও অন্য রঙের সমাহার, সেইসঙ্গে নানা ফুলের ছবি আঁকা।। ছাদের ওপরে হনুমানজী আর অন্যান্য কিছু মূর্তি, মাঝখানে একটি ছাউনির তলায় মহাদেবের মূর্তি। সব মিলিয়ে মন্দিরের ছাদটি বেশ একটু আলাদা দেখতে।

মন্দিরের মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠ। একটিতে হরপার্বতী, একটিতে শ্মশান কালী আর অন্যটিতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। বলা হয়, আদি মন্দিরটি নাকি প্রায় সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন, যদিও বর্তমান যে মন্দিরটি আমরা দেখি, সেটি প্রাচীন মন্দিরের জায়গায় নতুন করে গড়া হয়েছে বছর তিরিশ আগে। জায়গাটি আগে ছিল শ্মশান, পাশ দিয়ে বয়ে যেত বিদ্যাধরী নদী। সেই শ্মশানে মূলতঃ অপঘাতে মৃতদেরই দাহ করা হতো আর সেই শ্মশান আর এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে চলত নানারকমের তন্ত্রসাধনা। সেই সাধনারই চিহ্নস্বরূপ এখানে হরপার্বতীর পায়ের কাছে পাঁচটি মাথার খুলি সাজানো আছে, যেগুলি নাকি প্রায় চার পাঁচশো বছরের পুরনো, এবং বেশ জাগ্রত। এখন যদিও এখানে শ্মশানের ব্যবহার আর নেই,

তবু সেই সময়কার আচার অনুষ্ঠানের রেশ এখনো কিছুটা ধরা আছে এখনকার রীতিতে। যেমন, এখানে শ্মশান ছিল বলে যেমন শ্মশানকালীর পুজো হয়, তেমনই শ্মশানচারী আর ভূতপ্রেতদের অধীশ্বর বলে শিবেরও পুজো হয় খুব গুরুত্ব দিয়ে। তার প্রকাশ দেখা যায় - চৈত্রমাসে নীল পুজোর সময়ে। সেই সময়ে প্রায় দেড়শোর মতো পাঁঠাবলি হয়, এবং তাদের মুণ্ড রান্না করা হয় শ্মশানবাসী ভূতপ্রেতদের নিবেদনের উদ্দেশ্যে। সেই রান্নার সময়ে শুধু পূজারী আর রান্নার লোক ছাড়া কেউ সেখানে থাকতে পারেনা। ভোগ তৈরি হয়ে গেলে, অশরীরীদের উদ্দ্যেশে সেই মাংসভোগ নিবেদন করে, সবাই সেই জায়গা ফাঁকা করে চলে আসেন। তবে, সাধারণভাবে এমনিতেই জায়গাটি একটু নির্জন, অন্ধকার ও গা ছমছমে, সন্ধ্যেবেলার পর খুব বেশি মানুষ এদিকে আসেন না, যদিও একটু দূরেই আলোকিত জগন্নাথ মন্দির। এই মন্দিরটির পেছনেই, আরো অন্ধকারের মধ্যে একটি বহু প্রাচীন গাছ আছে, সেখানে অনেকেই মনস্কামনা পূরণের জন্যে গিঁট বেঁধে আসেন।

রাধাগোবিন্দ মন্দির –

হাজরা কালীমন্দিরের প্রায় পাশেই আছে এই রাধাগোবিন্দ মন্দির। এটিতেও পাঁচটি চূড়ো আছে, তবে পাশাপাশি নয়, পঞ্চরত্ন মন্দিরের মতোই চার কোণে চারটি, এবং মাঝখানে একটি বড় চূড়ো। এখানেও নানারকম অলঙ্করণ ও দেওয়ালচিত্র আছে, মাথার ওপরে আছেন শেষনাগের ফণার তলায় উপবিষ্ট বিষ্ণু, সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী। আরো আছেন ব্রহ্মা, নারদ ও গরুড়। মন্দিরে শ্বেতপাথরের মূর্তিতে পূজিত হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণ বা রাধাগোবিন্দ। অর্থাৎ হাজরা কালী আর এই রাধাগোবিন্দ মন্দির মিলিয়ে এখানে শিব, কালী ও কৃষ্ণ - সবারই পুজো করা হয়।

বনবিবির মন্দির - কালী মন্দির আর রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশেই এই বনববির মন্দির । একটু অবাক লাগে, কারণ সুন্দরবনের গভীরে বাঘ বা অন্য হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচতে যে দেবীর পুজো করা হয়, তাঁর মন্দির এই শহরে কেন ! আসলে কয়েকশো বছর আগে এই এলাকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, হয়তো ছিল সুন্দরবনেরই অঙ্গ। এক পাশে বয়ে যেত বিদ্যাধরী নদী, আর অন্যপাশে শ্মশান। হয়তো বাঘেরও আনাগোনা ছিল। তাই, সেই হিসেবে দেখতে গেলে এখানে এই বনবিবির থান হয়তো আশ্চর্য কিছু নয়। তখন যা ছিল “ থান “, এখন সেখানেই গড়ে উঠেছে আধুনিক মন্দির। জঙ্গল বা বাঘ আজ আর নেই, কিন্তু সেদিনের ইতিহাসের ছোঁয়াটা রয়ে গেছে।

মন্দিরের মাথায় একটিই চূড়ো, অনেকটা যেন রথের মতো, গায়ে নানা মূর্তির ছবি। দুপাশে দুটি বাঘের মূর্তি, নির্দেশ করছে এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। ভেতরে বনবিবির মূর্তি, বাঘই তাঁর বাহন। তাই মানুষকে তিনি বাঁচান তাঁরই বাহনের আক্রমণ থেকে, মানুষও জঙ্গলে তাঁরই প্রার্থনা করে। তবে, মন্দিরে ঢুকতে

গিয়েই একটু হোঁচট খেলাম । সিঁড়ির ওপর একটি মাঝারি সাইজের কাঁকড়া বিছে ! না দেখতে পেল তার ওপরেই হয়তো পা পড়ত, আর তারপরেই সর্বনাশ ! তবে, তা যাতে না হয়, তার জন্যে পাশেই স্থানীয় ছেলেরা পাহারা দিচ্ছিল আর সবাইকে সাবধান করছিল। ওরাই জানালো এখানে এই ধরণের বিছে, বিষাক্ত পোকামাকড় বা এমনকি সাপ থাকাও অসম্ভব নয়। কারণ জায়গাটি একটু অন্ধকার আর ঝোপঝাড়ও আছে। তাই আর বেশি ঘোরাঘুরি করিনি, একেবারে মন্দিরের সামনে ছাড়া জুতোও আর খুলিনি। ফেরার সময়ে চোখে পড়ল একটি ছোট মন্দির - ভেতরে যমরাজ আর সাবিত্রী সত্যবানের মূর্তি। এখানেও বোধহয় পুরনো এক শ্মশানে মৃত্যুর দেবতাকে স্মরণ । আর পাশে, খোলা জায়গায় বেশ সুন্দর একটি শিবের মূর্তি - সেটি ঠিক মন্দির নয়, মূলতঃ সৌন্দর্য্যের জন্যেই রাখা, যদিও ফুল আর মোমবাতি জ্বালানো আছে। এসবের পাশেই, গাছের তলায় আধা অন্ধকারে অনেক দেবদেবীর মূর্তি এলোমেলোভাবে রাখা। হঠাৎ দেখলে একটু চমকে যেতে হয়। আসলে মনে হয়, কাছাকাছি গ্রাম বা লোকালয়ে কোন পুজোর পর নদী বা পুকুরে বিসর্জনের বদলে অনেকে হয়তো মুর্তিগুলোকে এখানেই এভাবে রেখে যান - সেটাই হয়তো তাঁদের বিসর্জন।

এই হল এখানকার তিন মন্দিরের গল্প। একটু দূরেই আলো ঝলমলে নতুন জগন্নাথ মন্দির, দূরে দূরে নিউটাউনের বড় বড় আধুনিক বিল্ডিং ও অফিস, আর তাদের মাঝেই আধা অন্ধকারে প্রাচীন এক শ্মশান ও জঙ্গলের জায়গায় এই সব মন্দির। অত আলোর কাছাকাছি থেকেও অপেক্ষাকৃত এই ফাঁকা জায়গায় সন্ধ্যার পরে একটু যেন রহস্য আর রোমাঞ্চে ঘেরা, গা ছমছম করা একটু দেবদর্শন।

ছবি ১ / ২২ - হাজরা কালী মন্দিরের পাঁচটি চুড়ো । দুপাশে হনুমানজী আর অন্যান্য কিছু মূর্তি, মাঝখানে একটি ছাউনির তলায় মহাদেবের মূর্তি।



ছবি ২ / ২২ - হাজরা কালী মন্দিরের পাঁচটি চুড়ো । দুপাশে হনুমানজী আর অন্যান্য কিছু মূর্তি, মাঝখানে একটি ছাউনির তলায় মহাদেবের মূর্তি।



ছবি ৩ / ২২ - হাজরা কালীমন্দিরের হরপার্বতী মূর্তি । পায়ের কাছে পাঁচটি মাথার খুলি সাজানো আছে, যেগুলি নাকি প্রায় চার পাঁচশো বছরের পুরনো, এবং বেশ জাগ্রত। তবে এখানে একটি খুলিই দেখা যাচ্ছে, বাকীগুলি ফুলের তলায় ঢাকা পড়ে গেছে।



ছবি ৪ / ২২ - হাজরা কালীমন্দিরের হরপার্বতী মূর্তি ।পায়ের কাছে পাঁচটি মাথার খুলি সাজানো আছে, যেগুলি নাকি প্রায় চার পাঁচশো বছরের পুরনো, এবং বেশ জাগ্রত। তবে এখানে একটি খুলিই দেখা যাচ্ছে, বাকীগুলি ফুলের তলায় ঢাকা পড়ে গেছে।



ছবি ৫ / ২২ - হাজরা কালীমন্দিরের শ্মশানকালী মূর্তি ।



ছবি ৬ / ২২ - হাজরা কালীমন্দিরে।



ছবি ৭ / ২২ - হাজরা কালীমন্দিরের পেছনেই, একটি বহু প্রাচীন গাছ আছে, সেখানে অনেকেই মনস্কামনা পূরণের জন্যে গিঁট বেঁধে আসেন।



ছবি ৮ / ২২ - রাধাগোবিন্দ মন্দির - হাজরা কালীমন্দিরের প্রায় পাশেই। দূরে নিউটাউনের বড় বড় বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে হাল্কাভাবে।



ছবি ৯ / ২২ - রাধাগোবিন্দ মন্দির । এটিতেও পাঁচটি চূড়ো আছে, তবে পাশাপাশি নয়, পঞ্চরত্ন মন্দিরের মতোই চার কোণে চারটি, এবং মাঝখানে একটি বড় চূড়ো। এখানেও নানারকম অলঙ্করণ ও দেওয়ালচিত্র আছে, মাথার ওপরে আছেন শেষনাগের ফণার তলায় উপবিষ্ট বিষ্ণু, সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী। আরো আছেন ব্রহ্মা, নারদ ও গরুড়।



ছবি ১০ / ২২ - রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাইরে দেওয়াল চিত্র ।



ছবি ১১ / ২২ - রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাইরে দেওয়াল চিত্র ।



ছবি ১২ / ২২ - রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাইরে দেওয়াল চিত্র ।



ছবি ১৩ / ২২ - রাধাগোবিন্দ মন্দিরের ছাদে শেষনাগের ফণার তলায় উপবিষ্ট বিষ্ণু, সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী। আরো আছেন ব্রহ্মা, নারদ ও গরুড়।



ছবি ১৪ / ২২ - রাধাগোবিন্দ মন্দিরে শ্বেতপাথরের মূর্তিতে পূজিত হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণ বা রাধাগোবিন্দ। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মের ওপরে ।



ছবি ১৫ / ২২ - রাধাগোবিন্দ মন্দিরে শ্বেতপাথরের মূর্তিতে পূজিত হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণ বা রাধাগোবিন্দ। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মের ওপরে ।



ছবি ১৬ / ২২ - বনবিবির মন্দির । মন্দিরের মাথায় একটিই চূড়ো, অনেকটা যেন রথের মতো, গায়ে নানা মূর্তির ছবি। দুপাশে দুটি বাঘের মূর্তি, নির্দেশ করছে এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য।



ছবি ১৭ / ২২ - বনবিবির মন্দিরে বনবিবির মূর্তি, বাঘই তাঁর বাহন।



ছবি ১৮ / ২২ - বনবিবির মন্দিরে সিঁড়ির ওপর দেখা পেলাম মাঝারি সাইজের এই কাঁকড়া বিছের !



ছবি ১৯ / ২২ - মন্দির প্রাঙ্গণে গাছের তলায় অনেক দেবদেবীর মূর্তি এলোমেলোভাবে রাখা। আসলে মনে হয়, কাছাকাছি গ্রাম বা লোকালয়ে কোন পুজোর পর নদী বা পুকুরে বিসর্জনের বদলে অনেকে হয়তো মুর্তিগুলোকে এখানেই এভাবে রেখে যান - সেটাই হয়তো তাঁদের বিসর্জন।



ছবি ২০ / ২২ - পাশেই একটি ছোট মন্দির - ভেতরে যমরাজ আর সাবিত্রী সত্যবানের মূর্তি।
এখানেও বোধহয় পুরনো এক শ্মশানে মৃত্যুর দেবতাকে স্মরণ ।



ছবি ২১ / ২২ - খোলা জায়গায় বেশ সুন্দর একটি শিবের মূর্তি - সেটি ঠিক মন্দির নয়, মূলতঃ সৌন্দর্য্যের জন্যেই রাখা, যদিও ফুল আর মোমবাতি জ্বালানো আছে।



ছবি ২২ / ২২ - ফেরার পথে দূর থেকে আলোকিত জগন্নাথ মন্দির ।



Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 1w
অনেক কিছু জানতে পারলাম। ছবিগুলো খুব সুন্দর। 🙏

Reply Share

Subrata Ghose · 1w
Ghosh Ruchismita ধন্যবাদ। আমার নিজেরই সেভাবে জানা ছিল না, ওখানে গিয়েই জানতে পেরেছি। 😊

Reply Share

Gunjan G Traveler · 1w
পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রতিটি ছবি আলাদা করে দেখছিলাম। প্রতিটি ছবিই যেন নতুন করে মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সত্যিই চমৎকৃত হয়েছি। অসাধারণ!

Reply Share

Gunjan G Traveler · 1w
কলকাতার মধ্যেই যে এত প্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির ছড়িয়ে রয়েছে, তা অনেকেরই জানা নেই। আপনার লেখার মাধ্যমে এই কম পরিচিত মন্দিরগুলির সম্পর্কে জানতে পারছি। সত্যিই এটি একটি দারুণ উদ্যোগ।

তবে মন্দিরের সিঁড়িতে বিছা দেখে সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। নতুন কিছু জানার জন্য আপনার এই আগ্রহ ও সাহস প্রশংসার যোগ্য। তবে সাবধানে থাকবেন। এই ধরনের পুরোনো জায়গায় বিষাক্ত পোকামাকড় বা সাপ থাকার সম্ভাবনা থাকে।

আপনার লেখায় সেই রোমাঞ্চকর পরিবেশটাও খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, পড়তে পড়তে যেন নিজেই সেই অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে যাই। আশা করি, ভবিষ্যতেও আপনার মাধ্যমে এমন আরও অনেক প্রাচীন, ঐতিহাসিক এবং কম পরিচিত স্থানের কথা জানতে পারব।

Reply Share

Subrata Ghose · 1w
Gunjan G Traveler ধন্যবাদ। আমি নিজেও তো অনেক কিছুই জানি না - জানার চাইতে না জানার পরিমাণ অনেক বেশি। নিউটাউনের জগন্নাথ মন্দির দর্শনের জন্যেই গিয়েছিলুম, সেখানে গিয়ে ঠিক তার বিপরীতেই এই তিনটি মন্দিরের সন্ধান পাই। জগন্নাথ মন্দিরের বিপরীতেই, কিন্তু এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। অনেকটাই অন্ধকার, অনেকটাই নির্জন । জগন্নাথ মন্দিরে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোগ, অথচ এখানে, এই কালী ও শিব মন্দিরে প্রচুর পশুবলি হয়। মনে হল, জগন্নাথ মন্দিরের পাশাপাশি এই মন্দিরগুলির কথাও বোধহয় বলা উচিত।

সুচিপত্র

ফুলের উপত্যকা

রুচিস্মিতা ঘোষ



Ghosh Ruchismita

ফুলের উপত্যকা

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার কাছে ক্ষীরাই (Khirai) একটি ফুলের বাগান বা ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস। যতদূর চোখ যাবে ফুল আর ফুল। শীতকালীন ফুলে ভরে রয়েছে মাইলের পর মাইল মাঠ। এমনই একটি ফুলের উপত্যকা লুকিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গে।

এক শীতের সকালে গাড়ি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম সেই ফুলের উপত্যকার উদ্দেশে। আমরা নিউটাউন থেকে NH 12 রাস্তা ধরে সাঁতরাগাছি হয়ে NH 16 ধরে কোলাঘাট, পাঁশকুড়া এবং অবশেষে ক্ষীরাই পৌঁছেছিলাম। মূল হাইওয়ে থেকে ক্ষীরাইয়ের ফুলের বাগানে যাওয়ার রাস্তাগুলো সরু এবং গ্রামের মাটির কাছাকাছি। একটি সমতল জায়গায় গাড়ি পার্ক করে আমরা বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলাম।

চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। লাল মাটির পথ, বাহারি ফুলের চাষ আর মৌমাছির গুঞ্জন। আঁকাবাকা নকশায় জমির পর জমি চাষ হয়েছে নানা রঙের গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, অ্যাস্টার, ক্যালেন্ডুলা আর গোলাপের মতো নানারকম ফুলে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কংসাবতী নদী। কংসাবতীর পলল মাটিতেই চাষ হয় এইসব ফুলের।

যদিও এই মরসুমে নদীতে জল দেখা যায় না, তবে বর্ষায় নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে।

দেখেছিলাম কাঁসাই ব্রিজের উপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ট্রেন চলে যাচ্ছে। তার ঝমঝম আওয়াজে ও সামনের মখমলী ফুলের গালিচায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ।

ঘোর কাটল যখন দুটি বাচ্চা ছেলে দুটি ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াল। কী সরল হাসিমাখা তাদের মুখ। ফুলের তোড়া দিয়ে এভাবেই এই গ্রামের মানুষেরা পর্যটকদের অভিবাদন জানায়। দরিদ্র ফুলচাষীদের কাছে ফুল ছাড়া আর কী-ই বা আছে। আমরা ফুলের তোড়া নিয়ে ওদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলাম। প্রথমে নিতেই চাইছিল না। আমি হেসে বললাম, নে না, মিষ্টি কিনে খাস। ওরা লজ্জা পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

আমরা আলপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম নানা ফুলের সৌরভ মেখে।

গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। বর্ষা শেষ হলেই শুরু হয় এখানে শীতের ফুল আর গাছ চাষের ব্যবস্থা। দুর্গাপুজো শুরুর কিছুদিন আগেই বীজ ছড়ানো হয়। নভেম্বরের শেষ থেকে গাছে কুঁড়ি ধরে আর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে দেখা যায় ফুলের মেলা।

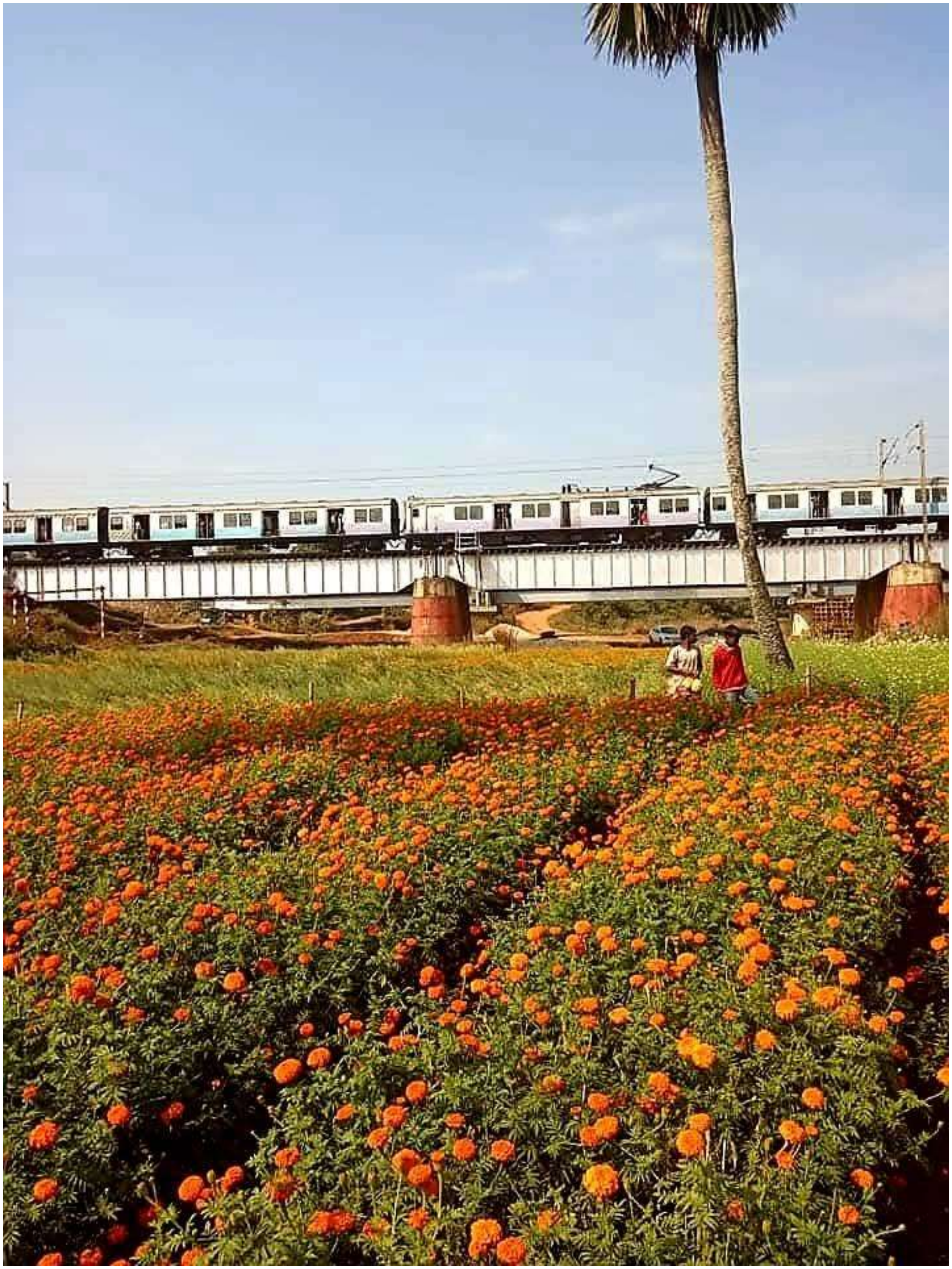
দৈনন্দিন ব্যস্ততা থেকে ছুটি নিয়ে কোনো শীতের সকালে ক্ষীরাই ঘুরে আসতে পারেন। এখানে এখনও অবধি থাকা- খাওয়ার জায়গা নেই। তবে যে হারে এখানে ক্ষীরাইয়ের জনপ্রিয়তা বাড়ছে তাতে একটু সমস্যার মুখে পড়েছেন ফুলচাষীরা। তাই স্থানীয় সংস্থাগুলো এগিয়ে আসছেন এখানে পর্যটন ব্যবস্থা সুন্দর করার জন্য।

ট্রেনে করে যদি যেতে চান, তবে হাওড়া থেকে খড়গপুর বা মেদিনীপুর লোকাল ট্রেনে চড়ে ক্ষীরাই স্টেশনে নামতে পারেন। তবে ট্রেন থেকে নেমে রেলপথ ধরে হাঁটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পাঁশকুড়া স্টেশনে নেমে সেখান থেকে টোটো বা অটো ধরে ক্ষীরাইয়ে যাওয়া সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ও সুবিধাজনক। সঙ্গে শুকনো খাবার ও জল নিয়ে অবশ্যই যাবেন। চা- ও ফ্লাস্কে ভরে নিয়ে যেতে পারেন। আমরা সঙ্গে চা ও শুকনো খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম ও রাস্তায় পড়ে KFC র দোকান। সেখানে নেমে ফ্রেশ হয়ে খাবার প্যাক করে নিয়েছিলাম লাঞ্চের জন্য।

ক্ষীরাইএর এই ফুলগুলোই পৌঁছে যায় হাওড়ার বিখ্যাত পাইকারি ফুলের বাজারে। মল্লিকঘাট এবং স্থানীয় সমবায় বা ব্যবসায়ীদের হাত ধরে এই ফুল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও পাশের রাজ্যগুলোতে সরবরাহ হয়ে থাকে।

আমরা সেখান থেকে অনেক ফুল ও ফুলগাছের চারা কিনে এনেছিলাম, যা আমাদের নিউটাউনের বাগানকে শোভিত করেছিল বহুদিন। যদিও আজ সবই স্মৃতি।





















চরৈবেতি চরৈবেতি ফেসবুক গ্রুপ ।







চরৈবেতি চরৈবেতি ফেসবুক গ্রুপ ।





চরৈবেতি চরৈবেতি ফেসবুক গ্রুপ ।

Selected Comments

Chandra Sekhar Dey · 3d
ট্রেনে আসা যাওয়ার সময় সুদূর বিস্তীর্ণ ফুলের ক্ষেত দেখা যায় তবে মাঠে গিয়ে দেখা কাশ্মীরের টিউলিপ দেখার সমতুল । ঘরেরই কোনে এত সৌন্দর্য । অপরিসীম ।
খুব ভালো লাগছে কাছের সৌন্দর্যের বিবরণ । 🙏

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 3d
Chandra Sekhar Dey অনেক ধন্যবাদ মতামতের জন্য।

Reply Share

Gunjan G Traveler · 3d
শব্দে ক্ষীরাইয়ের বর্ণনা সত্যিই অসামান্য—মন ছুঁয়ে গেল। এমন মুগ্ধকর শব্দচিত্রে মনে হলো, আমিও যেন হেঁটে বেড়িয়ে এলাম সেই রঙিন ফুলের উপত্যকায়।অনন্য বর্ণনাশৈলী- এটাই এক প্রকৃত সাহিত্যিকের পরিচয়।

ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের অপরূপ সৌন্দর্য, ফুলের তোড়া দিয়ে পর্যটকদের আন্তরিক অভ্যর্থনা, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ছোট ছোট মুহূর্তগুলো লেখায় যেন প্রাণ পেয়েছে। মোবাইলে তোলা ছবিগুলোও দারুণ—প্রতিটি ছবিই যেন লেখার সৌন্দর্যকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

তথ্য, অনুভূতি ও ভ্রমণ-সহায়িকা—এই তিনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই পোস্টে। কলকাতার এত কাছেই যে এমন মনভোলানো একদিনের ভ্রমণস্থল রয়েছে, তা অনেকেরই অজানা ছিল। এই লেখা নিঃসন্দেহে অসংখ্য ভ্রমণপ্রেমীকে ক্ষীরাই যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে এবং তাদের পরিকল্পনায় পথপ্রদর্শকের কাজ করবে।

আমার অনুরোধকে রেখে এক অনবদ্য, তথ্যসমৃদ্ধ ও হৃদয়ছোঁয়া লেখা উপহার দেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 3d
Gunjan G Traveler অনেক ধন্যবাদ এমনভাবে দেখার জন্য ও মতামতের জন্য। লেখা সার্থক মনে হয়।

Reply Share

Susmita Kumkum Bagchi · 3d
অপূর্ব সুন্দর এই ফুলের উপত্যকা বা ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সটি। আমাদের একবার সৌভাগ্য হয়েছিল নানা রঙের, নানা গন্ধের, নানা আকারের ফুলের সঙ্গে দেখা করার। অসাধারণ এই ফুলের উপত্যকাটি। আবার নতুন করে ঐ জায়গায় ফিরে গেলাম।

Reply Share Edited

Jayati Sen · 3d
বাহ দারুণ সুন্দর তো!

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 3d
Jayati Sen অনেক ধন্যবাদ।

Reply Share

সুচিপত্র

লোদি গার্ডেন

রুচিস্মিতা ঘোষ



Ghosh Ruchismita

লোদি গার্ডেন

নতুন দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত লোদি গার্ডেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস ও প্রকৃতির সংমিশ্রণ। ৯০ একর জুড়ে বিস্তৃত এই উদ্যানে সৈয়দ ও লোদি রাজবংশের বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থাপত্য রয়েছে। এটি মূলত মুহম্মদ শাহ এবং সিকন্দর লোদির রাজকীয় সমাধি হিসেবে ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে মোঘল আমলে এখানে একটি গ্রন্থাগার ও মানমন্দিরও তৈরি হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে সমাধিগুলোর চারপাশে ' খায়রপুর' নামে একটি গ্রাম গড়ে ওঠে।

১৯৬৮ সালে বিখ্যাত স্থপতি জোসেফ অ্যালেন স্টেইন উদ্যানটিকে নতুনভাবে ল্যান্ডস্কেপ করেন। এটি বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সুরক্ষিত।

১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে লেডি উইলিংডন এই প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলোর জন্য এলাকাটিকে একটি সুসজ্জিত ভূদৃশ্য হিসেবে নতুন করে নকশা করেন এবং প্রাথমিক ভাবে এর নাম দেন লেডি উইলিংডন পার্ক। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালে এর নাম পরিবর্তন করে লোদি গার্ডেন নাম রাখা হয়।

লোদি বংশটি আফগান রাজবংশোদ্ভুত ছিল। প্রথম লোদি শাসক ছিলেন বাহলুল লোদি (শাসনকাল ১৪৫১-৮৯) যিনি পাঞ্জাবের প্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন এবং ১৪৫১ সালে সৈয়দ রাজবংশের শেষ রাজাকে প্রতিস্থাপন করেন। বাহলুল ছিলেন একজন উদ্যমী নেতা, যিনি তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দিয়ে আফগান ও তুর্কি প্রধানদের একটি শিথিল জোটকে একত্রিত করে রেখেছিলেন।

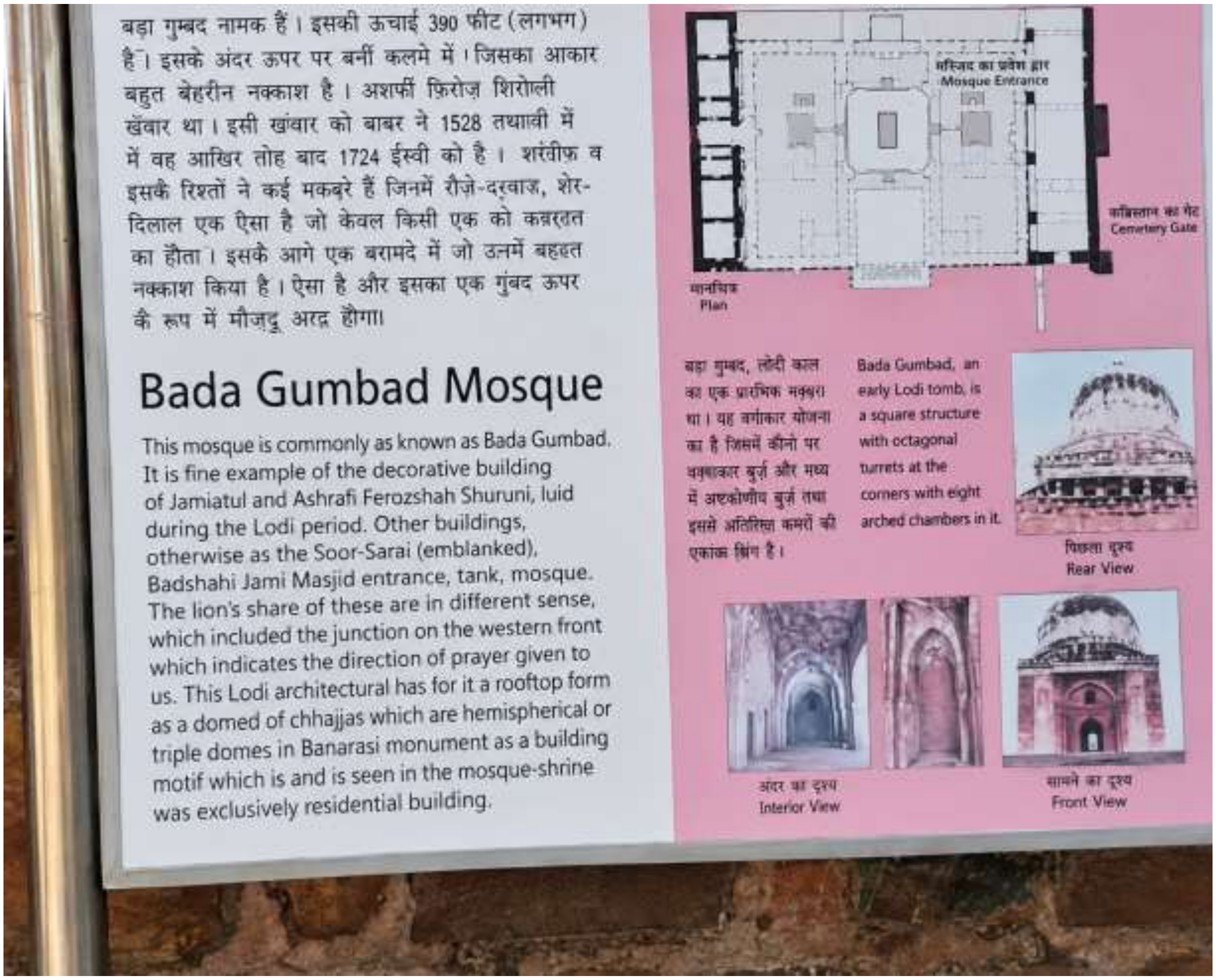
লোদি সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের উৎপত্তি নিয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনি গড়ে তোলে, যেখানে দাবী করা হয় যে তারা মূলত কাজাখাস্তানের অধিবাসী এবং পরশুরামের পৃথিবী শুদ্ধিকরণের পর একমাত্র টিকে থাকা ক্ষত্রিয় তারাই ছিল, যার ফলে তারা রাজা হতে সক্ষম হয়।

এই উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ :

ঐতিহাসিক সৌধ-- উদ্যানের ভিতর মহম্মদ শাহ এবং সিকান্দার লোদির সমাধিসৌধ, বড় গুম্বদ ও শীশ গুম্বদ।

প্রায় ৭০০০ প্রজাতির গাছ, একটি সুন্দর হ্রদ ও বোটানিক্যাল গার্ডেন রয়েছে।




बड़ा गुम्बद नामक हैं। इसकी ऊचाई 390 फीट (लगभग) है। इसके अंदर ऊपर पर बनीं कलमे में। जिसका आकार बहुत बेहरीन नक्काश है। अशर्फी फ़िरोज़ शिरोली खॅवार था। इसी खांवार को बाबर ने 1528 तथावी में में वह आखिर तोह बाद 1724 ईस्वी को है। शरंवीफ़ व इसके रिश्तों ने कई मकबरे हैं जिनमें रौज़े-दरवाज़, शेर-दिलाल एक ऐसा है जो केवल किसी एक को कब्ररहत का हौता। इसके आगे एक बरामदे में जो उनमें बहहत नक्काश किया है। ऐसा है और इसका एक गुंबद ऊपर कै रूप में मौजुदु अरद्द हौगा।
Bada Gumbad Mosque
This mosque is commonly as known as Bada Gumbad. It is fine example of the decorative building of Jamiatul and Ashrafi Ferozshah Shuruni, luid during the Lodi period. Other buildings, otherwise as the Soor-Sarai (emblanked), Badshahi Jami Masjid entrance, tank, mosque. The lion's share of these are in different sense, which included the junction on the western front which indicates the direction of prayer given to us. This Lodi architectural has for it a rooftop form as a domed of chhajjas which are hemispherical or triple domes in Banarasi monument as a building motif which is and is seen in the mosque-shrine was exclusively residential building.
मस्जिद का प्रवेश द्वार
Mosque Entrance
कब्रिस्तान का गेट
Cemetery Gate
मानचित्र
Plan
Bada Gumbad, an early Lodi tomb, is a square structure with octagonal turrets at the corners with eight arched chambers in it.
पिछला दृश्य
Rear View
अंदर का दृश्य
Interior View
सामने का दृश्य
Front View















SHISH-GUMBAD



Selected Comments

Subrata Ghose · 2w
দিল্লী কয়েকবার গেছি, বেশ কিছু জায়গায় গেছি - নিজে আলাদা করে বা দিল্লী ট্যুরিজম-এর HO HO Bus Serviceএ। তবে, এখানে যাওয়া হয়নি। জানা রইল, পরের বার গেলে যাওয়ার চেষ্টা করব।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 1w
Subrata Ghose অবশ্যই যাবেন। খুব সুন্দর

Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 2w
দিল্লী অনেকবার গিয়েছি কিন্তু না জানার জন্য এখানে যাওয়া হয়নি। এত সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ লেখা পড়ে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে । পরের বার অবশ্যই দেখব।
অনেক ধন্যবাদ 🙏

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 2w
Chandra Sekhar Dey অবশ্যই যাবেন। খুব সুন্দর।

Reply Share

Gunjan G Traveler · 2w
লেখা ও ছবির মাধ্যমে এই স্মৃতিসৌধের ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তথ্যসমৃদ্ধ ও সুন্দর উপস্থাপনার জন্য লেখাটি পড়ে সত্যিই ভালো লাগল। ছবিগুলোতে স্থাপত্যের সৌন্দর্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অনেকদিন পর এমন একটি মানসম্মত ভ্রমণবিষয়ক পোস্ট পড়ে মন ভরে গেল। ভবিষ্যতেও এ ধরনের তথ্যবহুল ও আকর্ষণীয় পোস্ট নিয়মিত পড়ার প্রত্যাশা রইল। এত সুন্দর একটি পোস্ট ভাগ করে নেওয়ার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 2w
Gunjan G Traveler ২০২৩ এ ঘুরে এসেছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল। অনেক পাখি আছে। গাছের ডাল থেকে ডালে ঘুরে বেড়ায়। ওদের ডাকের সুর কিংবা পাখিগুলোকে ক্যামেরায় ধরতে পারিনি।

Reply Share

সুচিপত্র

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান – পর্ব ১

সুস্মিতা বাগচী



Susmita Bagchi

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান - বড় সোনা মসজিদ বা বারাদুয়ারি।

ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রুপে এটাই প্রথম পোস্ট। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে ভ্রমণের প্রথম পদক্ষেপ এই রাজ্য থেকেই শুরু করলাম।

ভ্রমণ, এই সুন্দর শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে চঞ্চলতা, আনন্দ, ভালবাসা, উচ্ছ্বাস, শিহরণ, মোহ এক অজানা অনুভব যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার মাঝে যেন energy booster এর কাজ করে। তাই মাঝে মধ্যেই বেড়িয়ে পড়া অজানা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। পশ্চিমবঙ্গের এমনই একটা শহর মালদা, যেখানে মাটির পরতে পরতে রয়েছে ইতিহাসের গন্ধ।

ইতিহাসের পীঠস্থান এই মালদা জেলা। এটি প্রাচীন 'গৌড়' এবং 'পান্ডুয়া' (পুন্ড্রবর্ধন) সীমাতে ছিল। এই দুটি শহর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় যুগে বাংলার রাজধানী ছিল এবং ইংরেজবাজার শহর থেকে (একসময় ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এঞ্জেলজবাদ নামে পরিচিত) উত্তর ও দক্ষিণে ছিল।

মালদা শহরের ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে বাংলাদেশ সীমান্তে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ। গৌড়ের সবচেয়ে বিশাল স্থাপত্যকীর্তি বড় সোনা মসজিদ বা বারাদুয়ারি। এই মসজিদটি সত্যিই গৌড়ের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ভবন। সুলতান নসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এটিকে বারাদুয়ারি বলা হয়, বারোটি দরোয়াজা সমেত একটি বিল্ডিং এখন ১১টি দরোয়াজা খোলা আছে। এটির প্রধান ফটক দাখিল দরোয়াজা।

গৌড়ে অনেক দর্শনীয় স্থান আছে যেগুলি হল

লোটল মসজিদ, লুকোচুরি দরোয়াজা, কদম রসুল মসজিদ, ফিরোজ মিনার, চিকা মসজিদের মত দেখার জায়গা।

পান্ডুয়াতে সবচেয়ে বিখ্যাত আদিনা মসজিদ, কুতুব শাহি মসজিদ, একলাখি সমাধিসৌধ, গোল ঘর।

সঙ্গে বারাদুয়ারির কিছু ছবি দিলাম। মোবাইলে তোলা বলে ফটোর মান যথাযথ নয়।

তথ্য- সংগৃহীত

বড় সোনা মসজিদ



বারাদুয়ারি



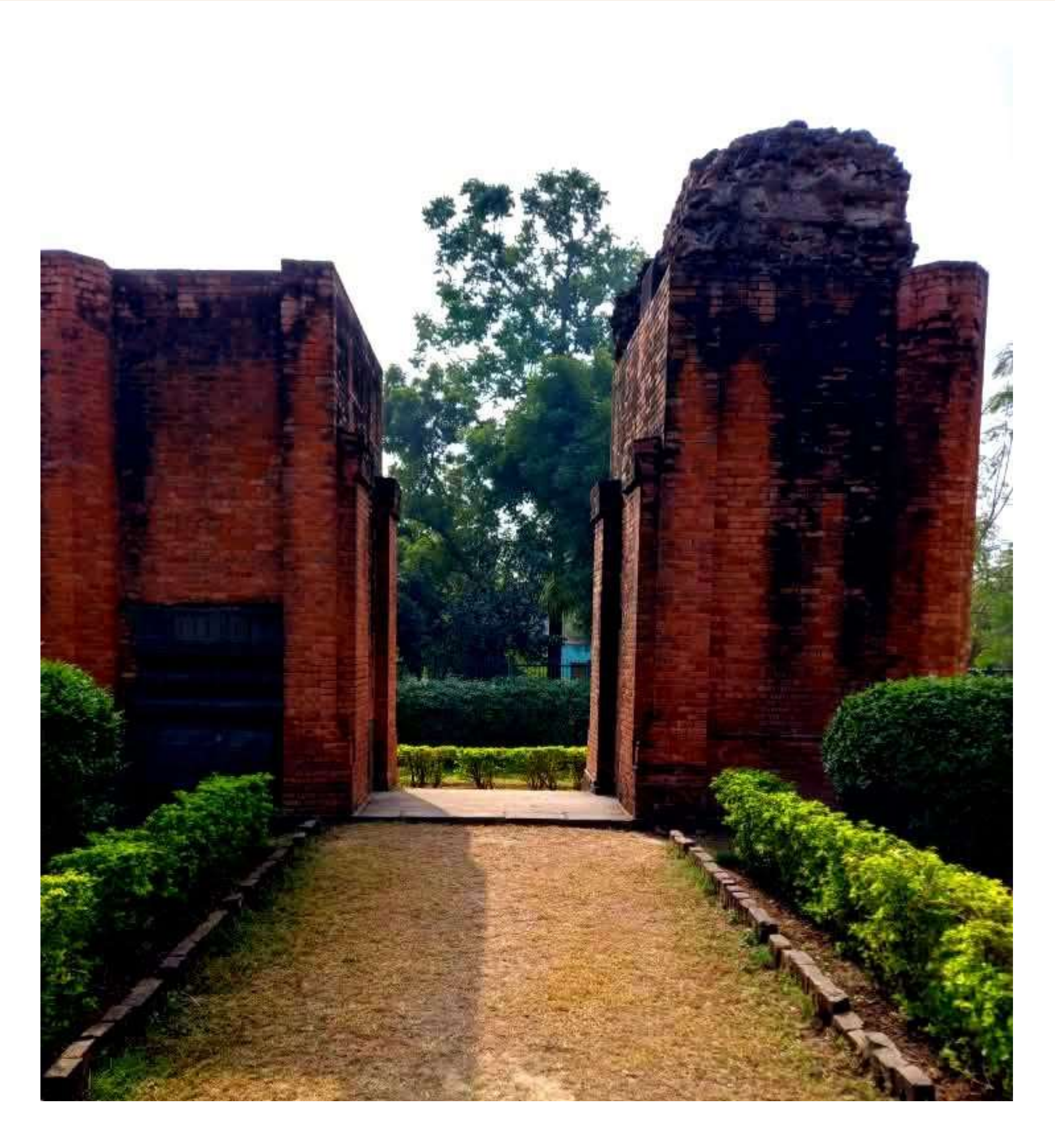


দাখিল দরোয়াজা বা বড় সোনা মসজিদ









বারোটি দরোয়াজা সমেত একটি বিল্ডিং



Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 4w
খুব সুন্দর ছবি ও পোস্ট। তার সঙ্গে তথ্য এবং কাহিনি। অনেক কিছু জানতে পারলাম। মানস- ভ্রমণ হয়ে গেল। অনেক ধন্যবাদ।

Reply Share

Gunjan G Traveler · 4w
প্রথম পোস্টে আপনাকে স্বাগত। লেখাটা খুবই ভাল এবং তথ্যপূর্ণ লেখা। ছবিগুলো প্রশংসা প্রাপ্য। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। এই গ্রুপের আগের গ্রুপটি ছিল শুধু চরৈবেতি ক্লোজড গ্রুপ। তাই নতুন করে এই গ্রুপটি আবার শুরু করা। সদস্য সংখ্যা খুবই কম তাই পাঠকের সংখ্যায় কম। অনুরোধ রাখলাম নিজের লেখাটা আপনার ফেসবুকে শেয়ার করুন। আমিও করছি।

Reply Share

সুচিপত্র

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান – পর্ব ২

সুস্মিতা বাগচী



Susmita Bagchi

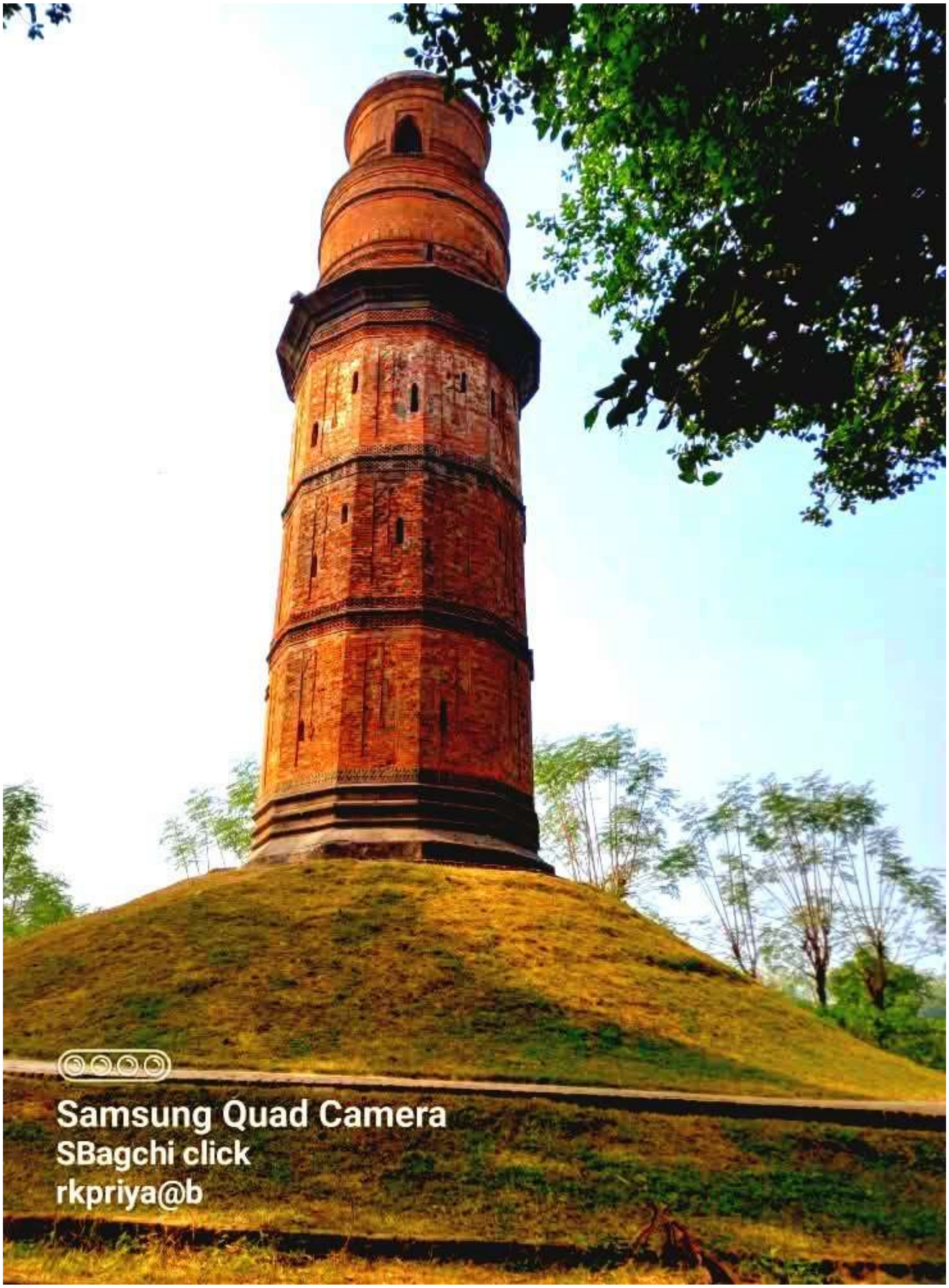
মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান - ফিরোজ মিনার

পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার ঐতিহাসিক শহর গৌড়ে অবস্থিত ফিরোজ মিনার বাংলার সুলতানি যুগের একটি বিখ্যাত স্থাপত্য। ১৪৮৫ থেকে ১৪৮৯ সালের মধ্যে হাবশী রাজবংশের সুলতান সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ এটি নির্মাণ করেন। দিল্লির কুতুব মিনারের আদলে নির্মিত এই মিনারটি স্থানীয়ভাবে 'পীর আশা মিনার' বা 'চিরাগ দানি' নামেও পরিচিত ।

মিনারটির উচ্চতা ২৬ মিটার (প্রায় ৮৪ ফুট) এবং এর পরিধি ১৯ মিটার। তুঘলকি স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এই মিনারটি মোট পাঁচতলা বিশিষ্ট। এর নিচের দিকের তিনটি তলা ১২-কোণ বিশিষ্ট এবং ওপরের দুটি তলা গোলাকার।মিনারের চূড়ায় ওঠার জন্য ভেতরে ৮৪টি সর্পিল সিঁড়ি বা প্যাঁচানো ধাপ রয়েছে। এটি তুঘলকি স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। ফিরোজ মিনারের দেয়ালগুলি জটিল পোড়ামাটির খোদাই দ্বারা আবৃত। পোড়ামাটির কাজ এবং লতাপাতার নকশা দিয়ে সাজানো। ধারণা করা হয়, সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বিজয় উদযাপনের জন্য এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর ওপর নজর রাখার জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন।

সংগৃহীত।

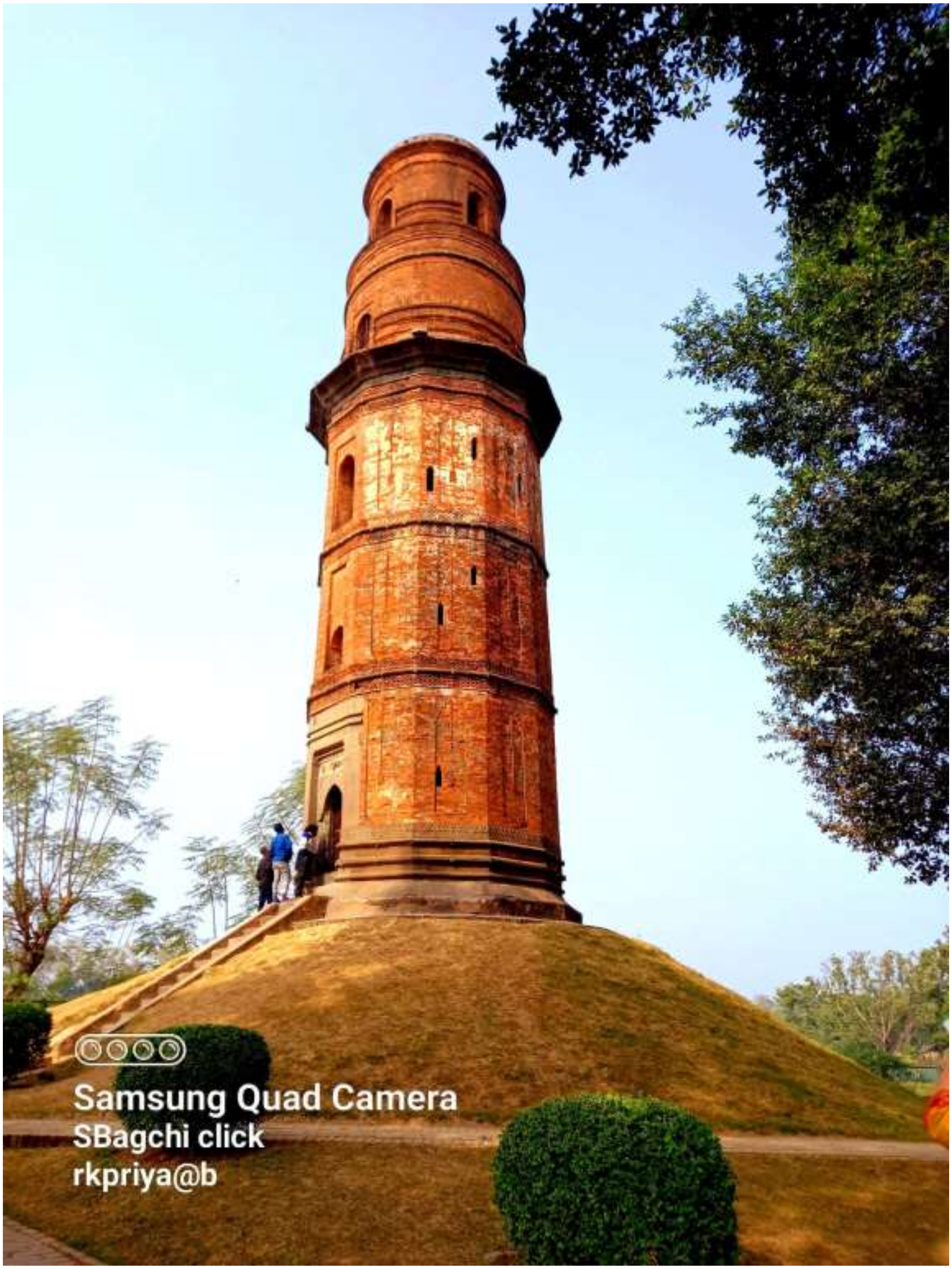
ফিরোজ মিনার



পাঁচতলা বিশিষ্ট স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত



সর্বোচ্চ তলা দুটি বৃত্তাকার



নীচের দিকের তিনটি তলা ১২ কোণ বিশিষ্ট







Selected Comments

Gunjan G Traveler · 3w
খুব সুন্দর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ছবিগুলো দুর্দান্ত। পোস্ট করার জন্যে ধন্যবাদ।
Reply Share

Susmita Kumkum Bagchi · 3w
Gunjan G Traveler 🙏
Reply Share

Ghosh Ruchismita · 3w
খুব সুন্দর। তথ্যপূর্ণ। ইতিহাস কথা বলে।
Reply Share

Susmita Kumkum Bagchi · 3w
Ghosh Ruchismita ধন্যবাদ
Reply Share

সুচিপত্র

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান – পর্ব ৩



সুস্মিতা বাগচী

Susmita Bagchi

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান – দাখিল দরওয়াজা

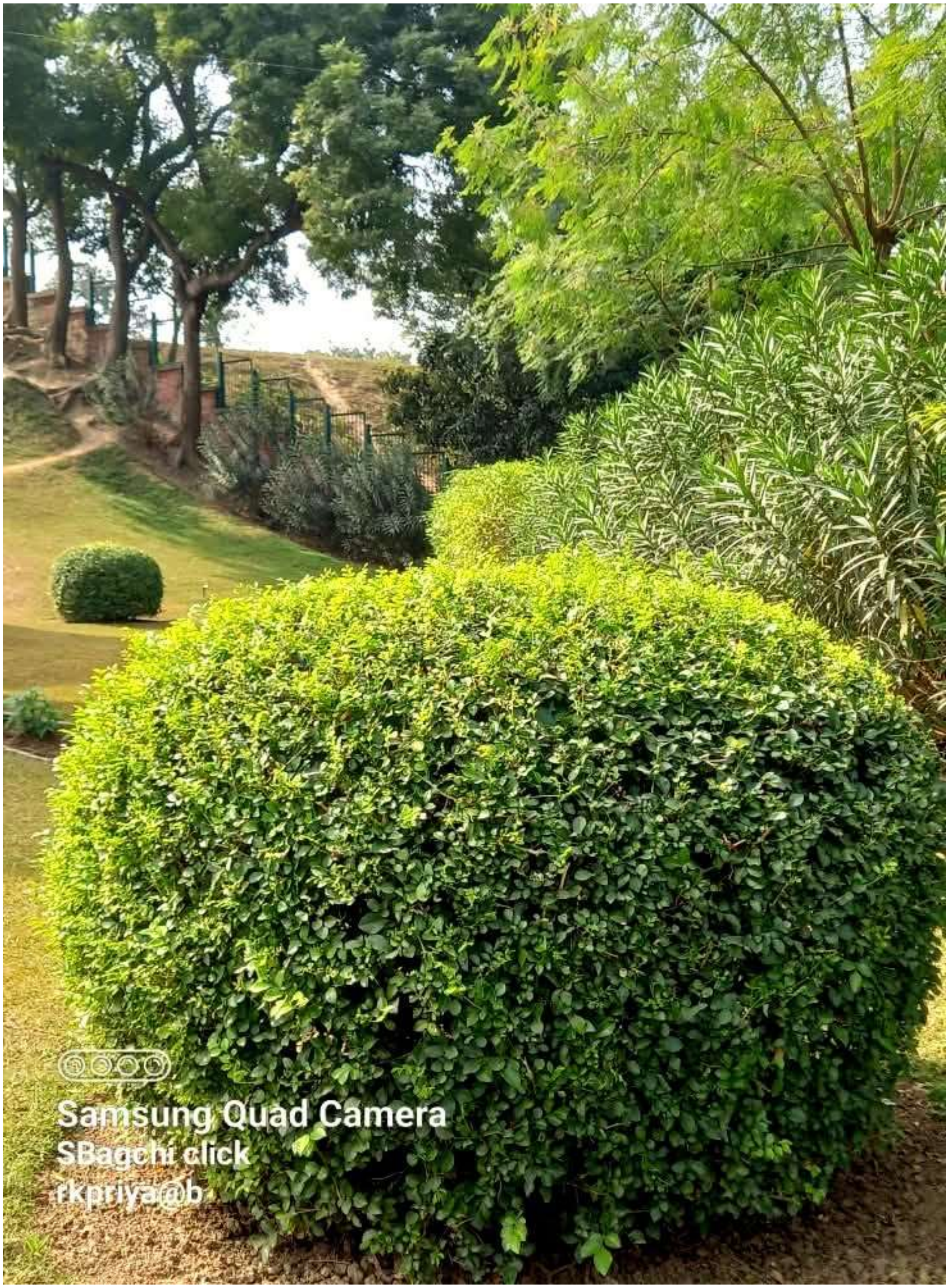
মালদা জেলার ঐতিহাসিক গৌড় অঞ্চলে অবস্থিত দাখিল দরওয়াজা হলো সুলতানি আমলের স্থাপত্যের সর্ববৃহৎ নিদর্শন। 'দাখিল দরওয়াজা' শব্দের অর্থ প্রবেশদ্বার (আরবি-দাখিল, ফারসি-দরওয়াজা)। এটি ১৫শ শতাব্দীতে নির্মিত মুসলিম শাসকদের রাজধানী গৌড়-দুর্গের প্রধান প্রবেশপথ ছিল এবং এটি লখনৌতি নামে পরিচিত গৌড় দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথ। বাংলায় সর্বকালের সবচেয়ে সুদৃঢ় ও সুন্দর প্রবেশ-তোরণ। একে 'সালামি দরওয়াজা'-ও বলা হতো।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক তথ্যমতে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ এটি নির্মাণ করেন, আবার কারও মতে ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বারবক শাহ এটি স্থাপন করেন। এই বিশাল প্রবেশদ্বারটির উচ্চতা ২১ মিটারেরও বেশি এবং প্রস্থ প্রায় ৩৪.৫ মিটার। ছোট লাল ইট এবং পোড়ামাটির অপূর্ব নকশা বা টেরাকোটার কাজে এটি সুসজ্জিত। দরওয়াজাটির চার কোণায় চারটি সুউচ্চ গোলাকার মিনার রয়েছে এবং এর ছাদগুলো সুন্দর খিলানযুক্ত। একবার দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে গেলে, এটি চারপাশের বাঁধ দিয়ে খোলে। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, ২০ মিটার উঁচু প্রাচীর একটি পুরানো প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষকে ঘিরে রেখেছে। অতীতে এখান থেকে কামান ছোড়া হতো। তাই গেটটি 'সালামি দরওয়াজা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

NB: মালদা শহরের কোণায় কোণায় ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণ তথ্য একটি পোস্টে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রতিটি স্থাপত্যের আলাদা আলাদা তথ্য পোস্ট করা হচ্ছে।

সংগৃহীত

বাগানের একটি অংশবিশেষ



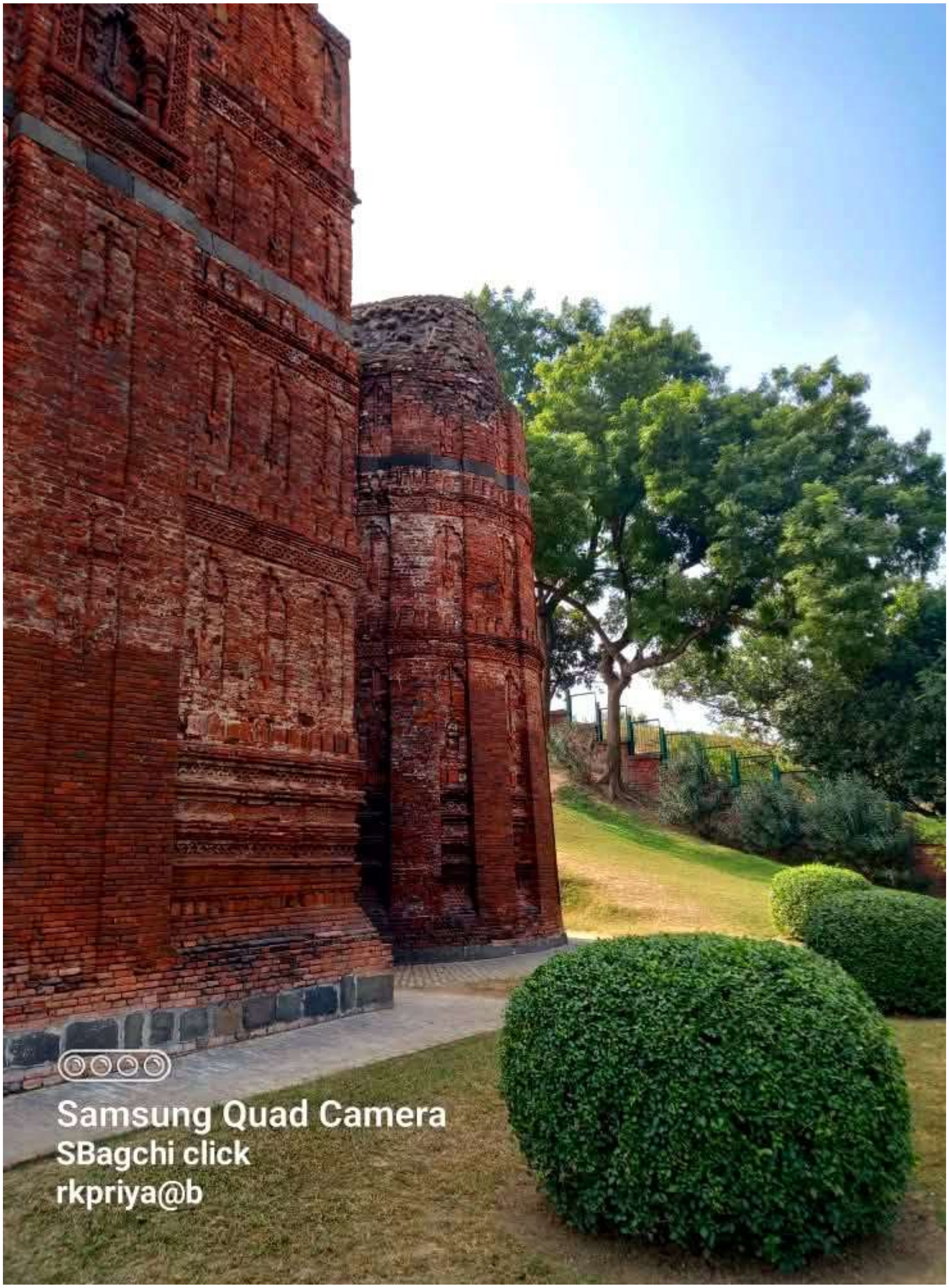
দাখিল দরওয়াজা



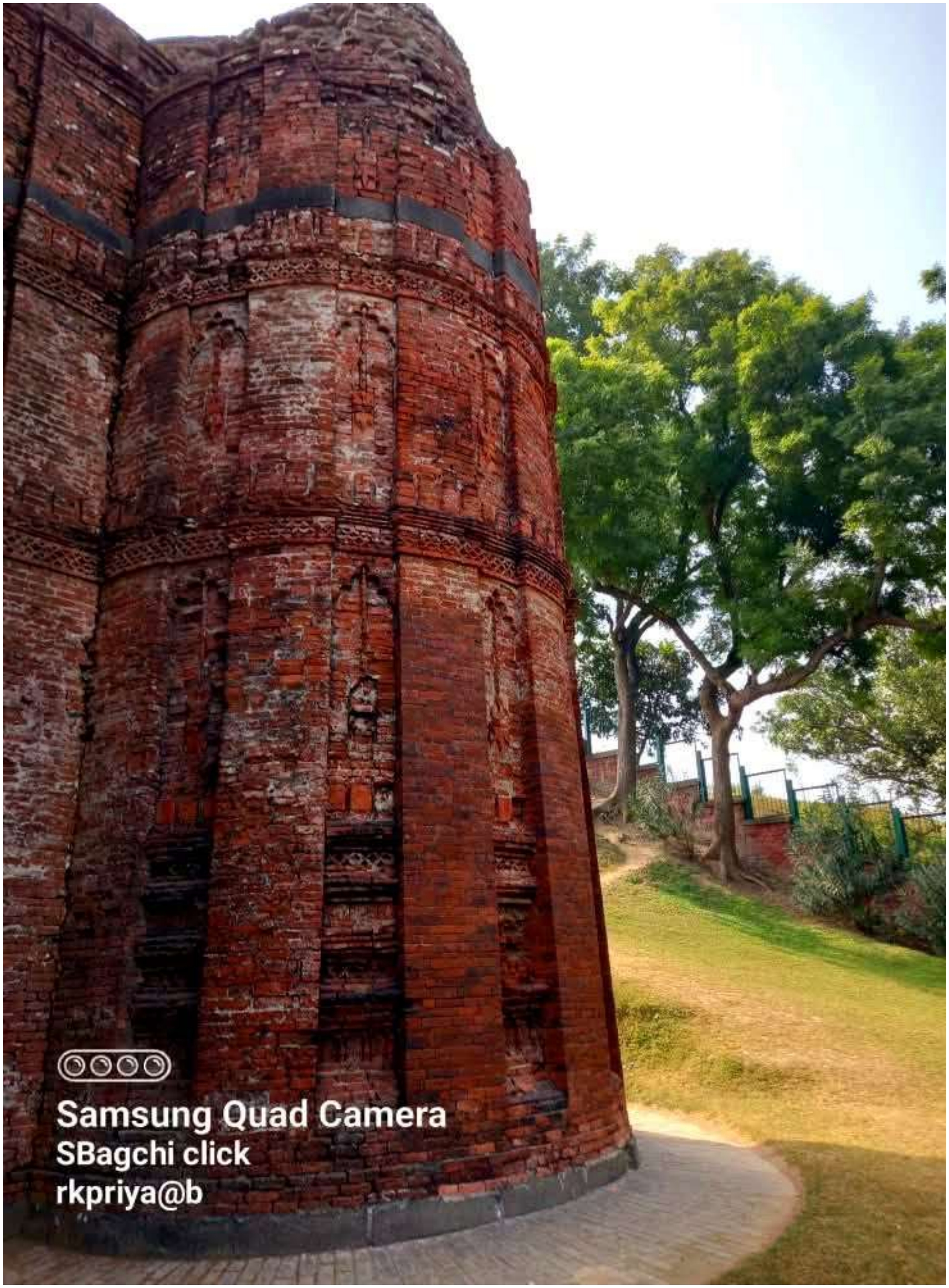
চারটি কোণে রয়েছে সুউচ্চ পাঁচতলা বিশিষ্ট গোলাকার মিনার



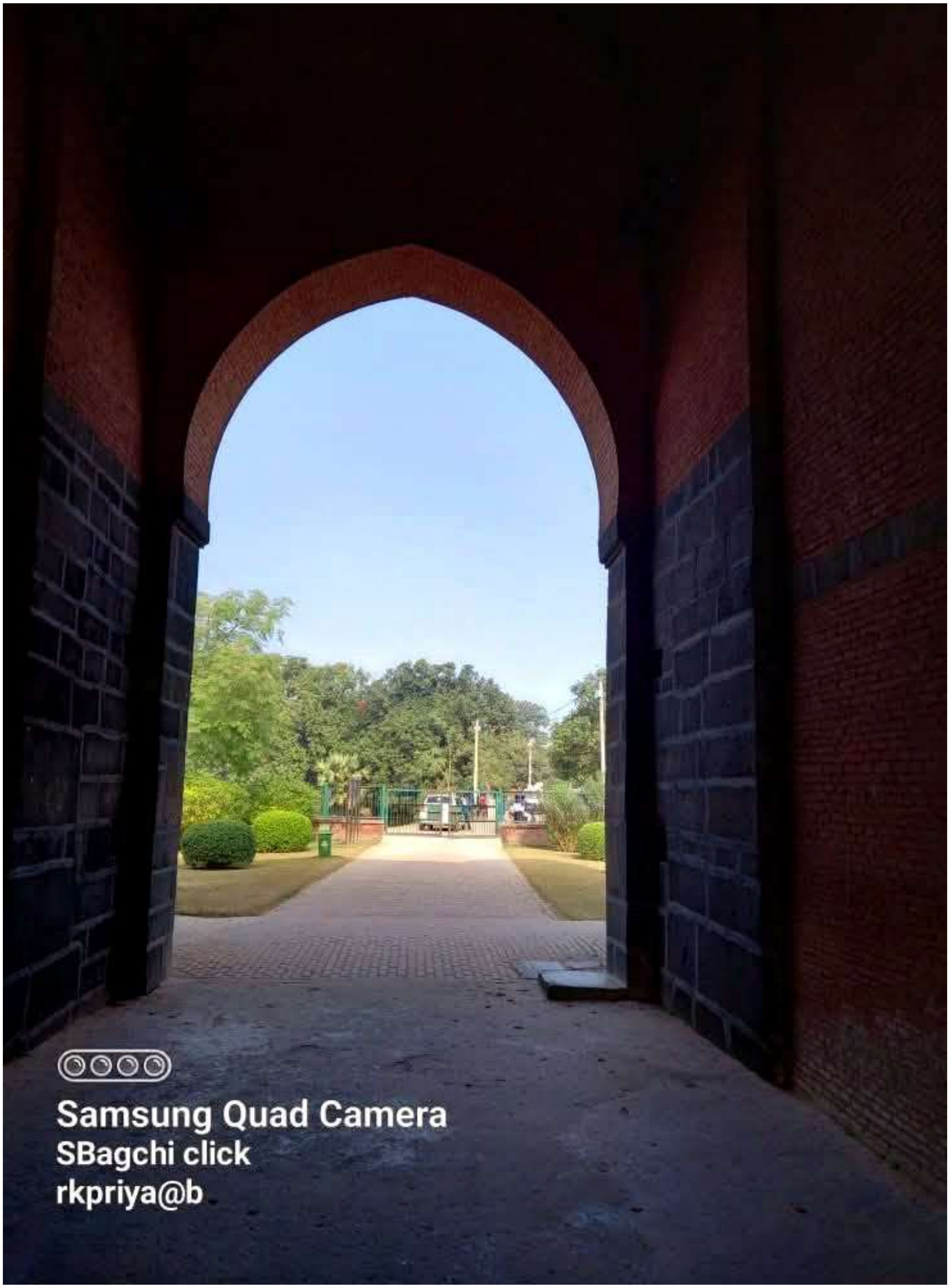
ছোট লাল ইট দ্বারা গঠিত এটি



সুউচ্চ গোলাকার মিনার



প্রবেশদ্বার থেকে সুদৃশ্য বাগান



প্রবেশদ্বার



Selected Comments

Gunjan G Traveler · 3w
দারুণ তথ্যপূর্ণ পোষ্ট। খুব ভালো লাগলো ইতিহাস ও স্থাপত্যের কথা জেনে। ক্যাপশন সহ ছবিগুলোও খুব সুন্দর লাগছে।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 3w
খুব সুন্দর পোস্ট। অজানা ইতিহাস জানতে পারছি। ছবিগুলো দারুণ।

Reply Share

Gunjan G Traveler · 18m
ছোট লাল ইটের প্রচলন শুরু হয় লক্ষ্ণৌ থেকে , যার কারনে এই স্থাপত্যের নাম মনে হয় লখনৌতি।

Reply Share

সুচিপত্র

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান – পর্ব ৪
সুস্মিতা বাগচী



Susmita Bagchi

মালদা গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান – চিকামসজিদ

মালদা জেলার গৌড় অঞ্চলে অবস্থিত অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান হলো চিকা মসজিদ। এর স্থাপত্য শৈলী ও ইতিহাস পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়।

চিকা শব্দটি স্থানীয় ভাষায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে একসময় এই মসজিদে প্রচুর বাদুর বাস করত, তাই এর নাম চিকা মসজিদ। আবার কেউ কেউ এর চকচকে মিনা করা ইটের উজ্জ্বলতার কারণে মসজিদটির নাম চমকান বা চিকা হয়েছে বলে মনে করেন।

এটি ১৫শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। বিভিন্ন তথ্য অনুসারে সুলতান ইউসুফ শাহ (১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) অথবা নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৫-১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) এটি নির্মাণ করেছিলেন।

স্থাপত্যের দিক থেকে এক-গম্বুজবিশিষ্ট এই প্রাচীন ইমারতটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছিল। এটি লাল ইঁট এবং পোড়ামাটির সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা নির্মিত। বাইরে থেকে মসজিদ মনে হলেও, এর পশ্চিম দেওয়ালে কোনো মেহরাব নেই। গবেষকদের মতে, এটি কোনো মসজিদ নয়, বরং এটি এক গম্বুজযুক্ত বিশিষ্ট মাজার বা কারাগার হতে পারে। এর দেয়ালে ইসলামিক স্থাপত্যের পাশাপাশি হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীর প্রভাবও দেখা যায়, যা এটিকে বিশেষভাবে অনন্য করে তুলেছে। এর দরজা এবং লিন্টারের পাথরের কাজে হিন্দু দেব-দেবীর খোদাই করা মূর্তি এখনও আংশিকভাবে দৃশ্যমান, যা প্রাচীন বাংলার হিন্দু ও ইসলামিক সংস্কৃতির মিশ্রণের এক অনন্য নিদর্শন।

বর্তমানে এটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দ্বারা সংরক্ষিত একটি ঐতিহাসিক স্থান।

চিকা মসজিদ মালদা জেলার গৌড় এলাকায় অবস্থিত যা বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি।

মসজিদটি সারাবছর পর্যটকদের জন্য খোলা থাকে।

চিকা মসজিদ পরিদর্শনের সময় প্রচুর হাঁটাচলার প্রয়োজন হতে পারে তাই আরামদায়ক জুতো পরা বাঞ্ছনীয় এবং কাছাকাছি পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার বা পানীয় দোকান না থাকায় সঙ্গে পানীয় জল রাখা খুবই জরুরী।

ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের সময় এর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

ইতিহাস ও স্থাপত্য ভালবাসলে মালদার চিকা মসজিদ একটি দারুণ ভ্রমণ গন্তব্য হতে পারে।

সংগৃহীত

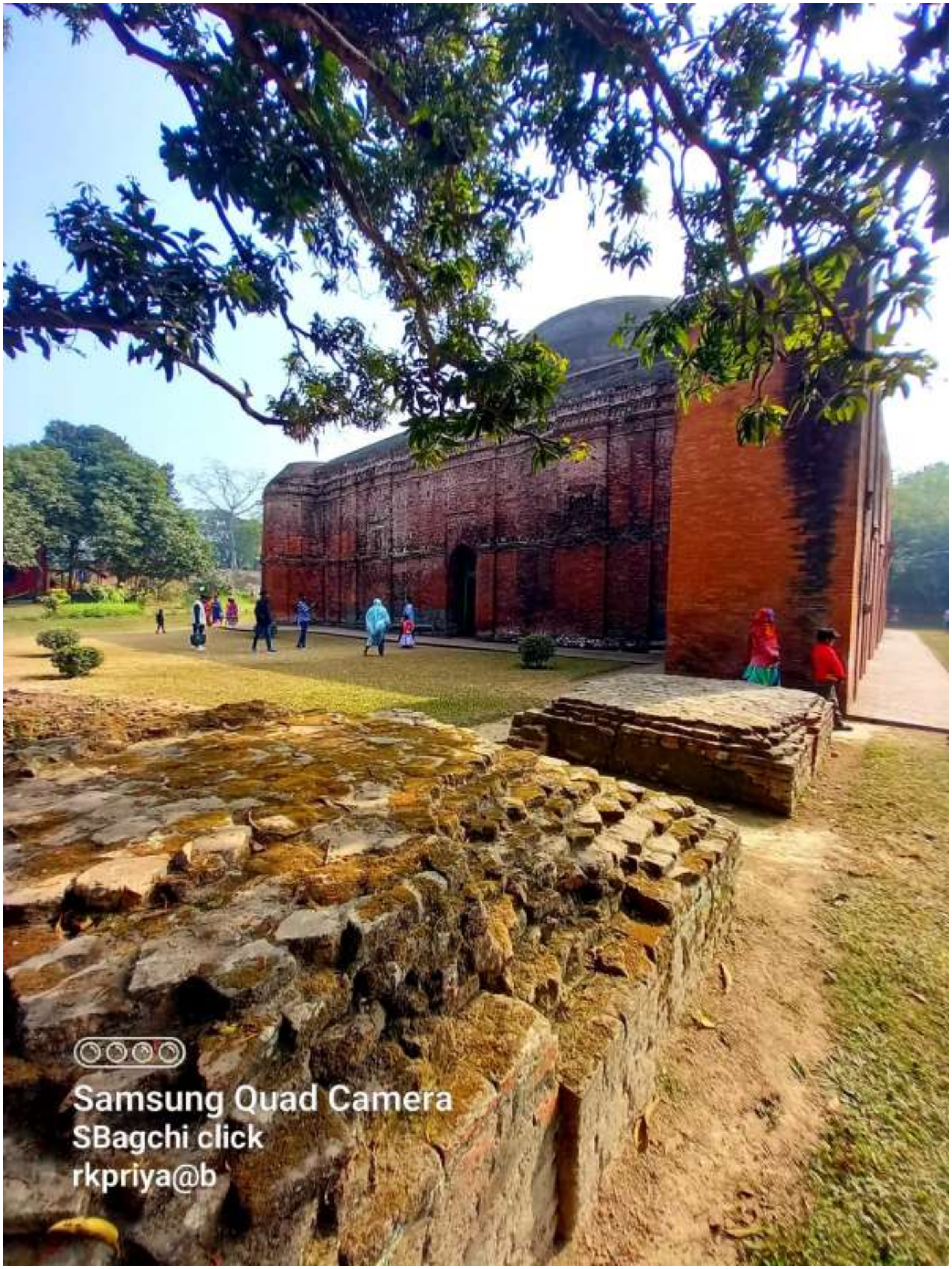
চিকা মসজিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস



দূর থেকে আমার চোখে চিকা মসজিদ



আর এক কোণ থেকে মুঠোফোনের ক্যামেরার লেন্সে মসজিদটির গঠন শৈলীকে বন্দি করা



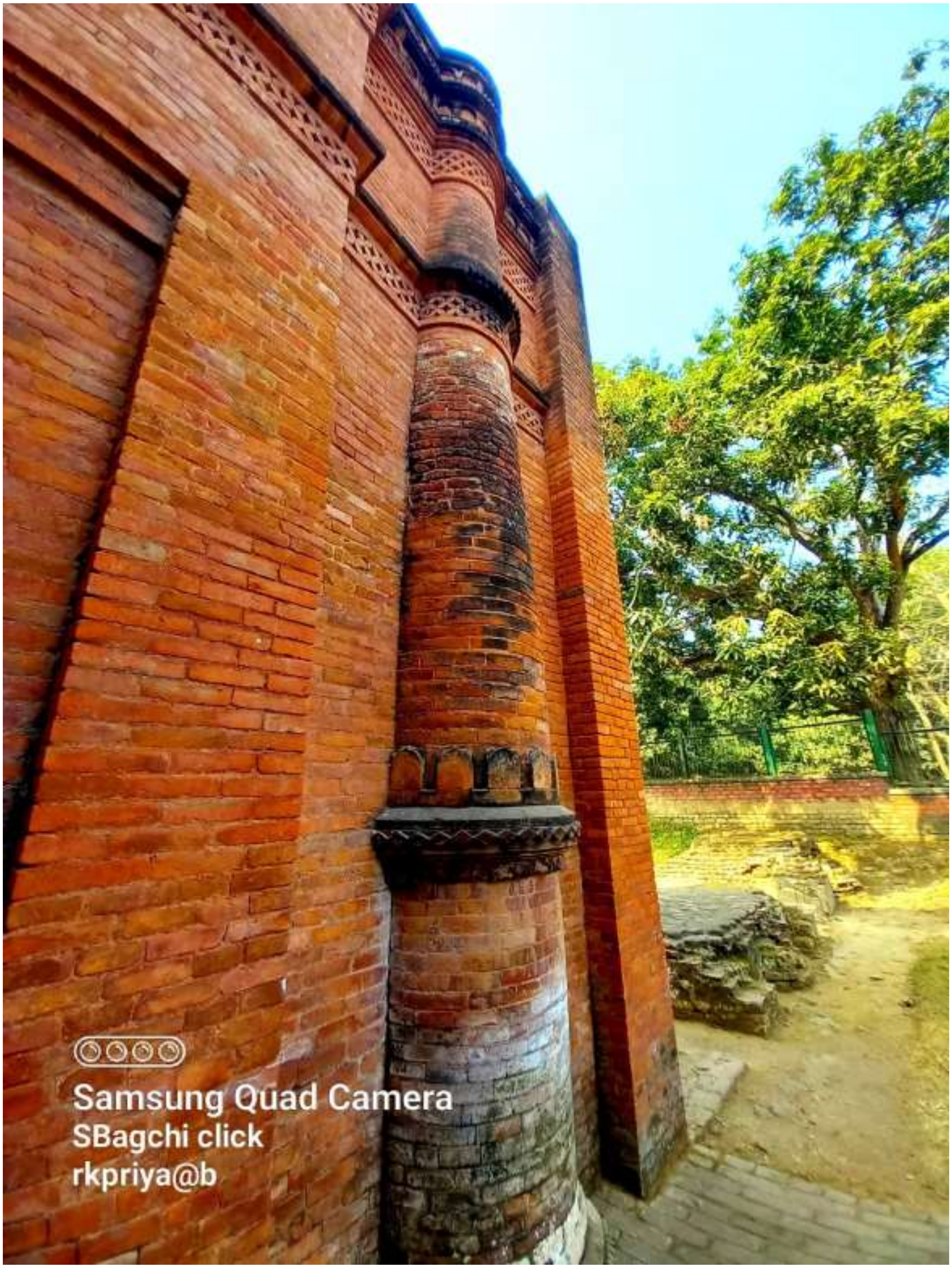
মুখোমুখি মুঠোফোনে তোলা, আলোর বিপরীতে



ছোট ছোট লাল ইটের গাঁথুনী



অপূর্ব স্থাপত্য শৈলী



আশেপাশে সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চত্বর



চিকা মসজিদের অন্দরের প্রবেশদ্বার



এমনভাবে প্রবেশদ্বারটি তার দ্বারা গঠিত মনে হয় জেলখানার দরওয়াজা। কথিত আছে এখানে সনাতন গোস্বামীকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।



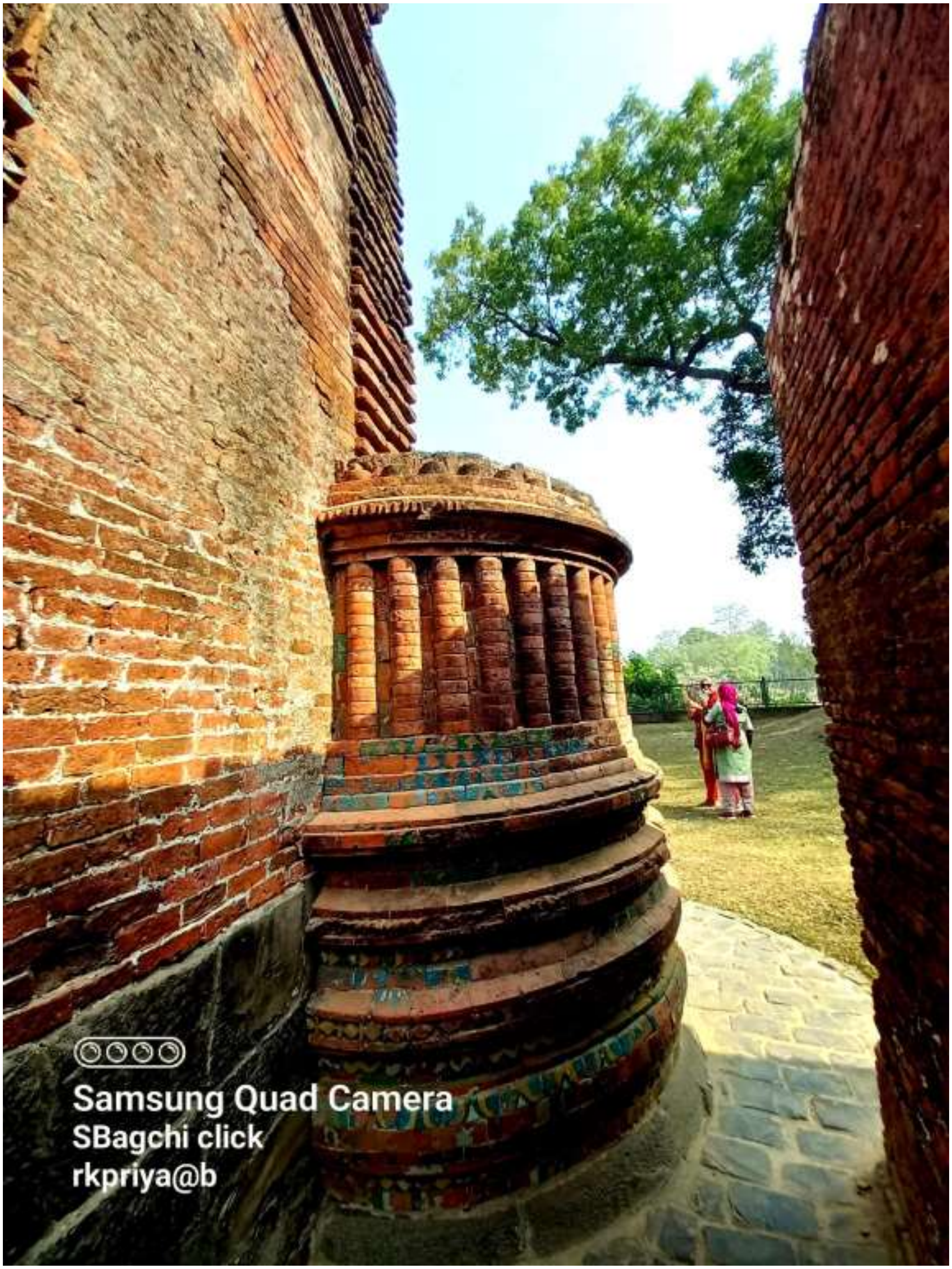
অন্দর থেকে গম্বুজের আকৃতি, যখন মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল তখন এইখানেই বাদুরদের সভা বসত। আমরাও বাদুরদের সভা কিছুক্ষণ উপভোগ করেছি 😀



বাইরের স্থাপত্য শৈলী



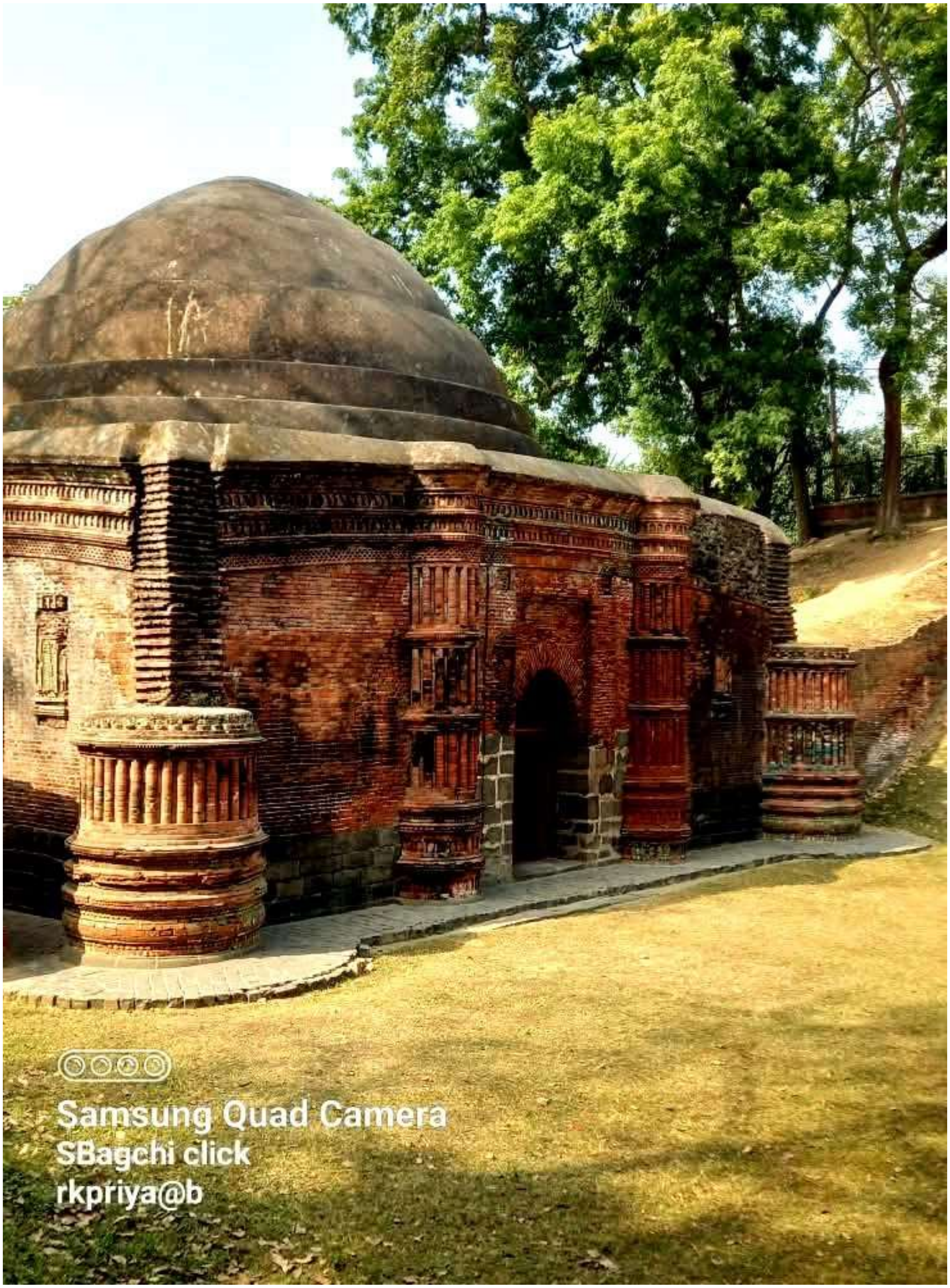
ছোট ছোট চকচকে ইট দিয়ে গঠিত



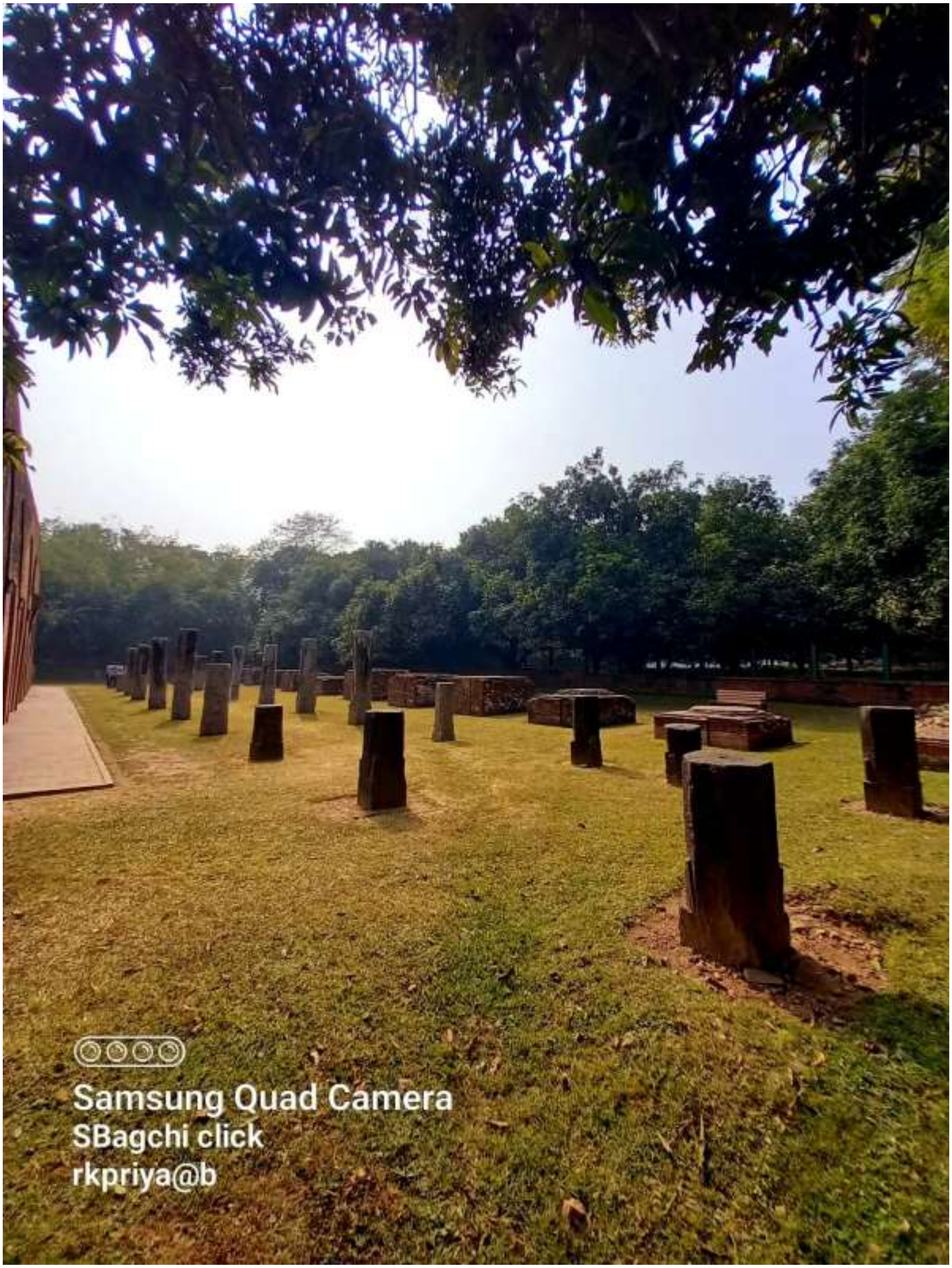
স্থাপত্য শৈলী মুগ্ধ করে



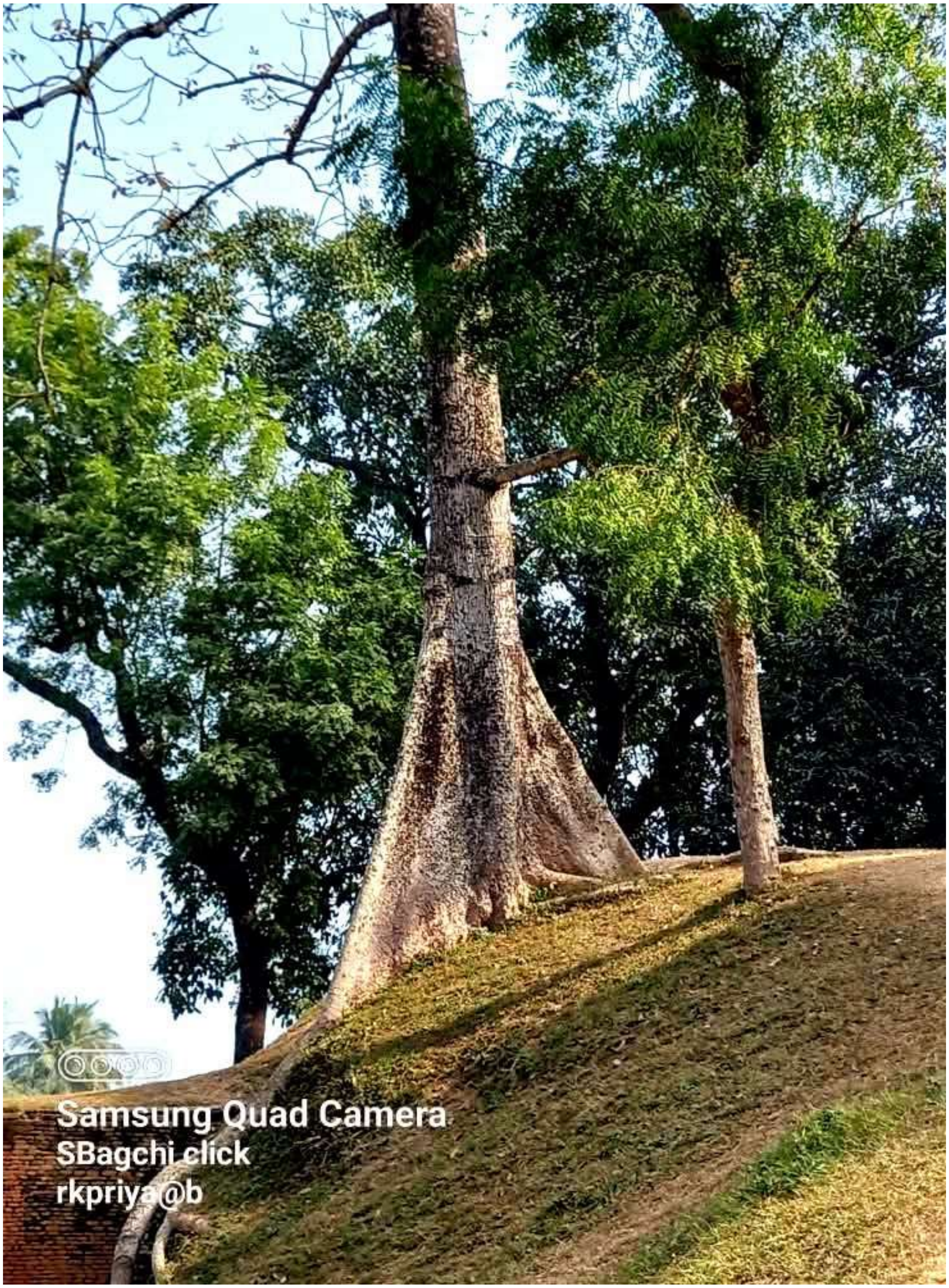
গম্বুজটির চারদিকে চারটি প্রবেশদ্বার



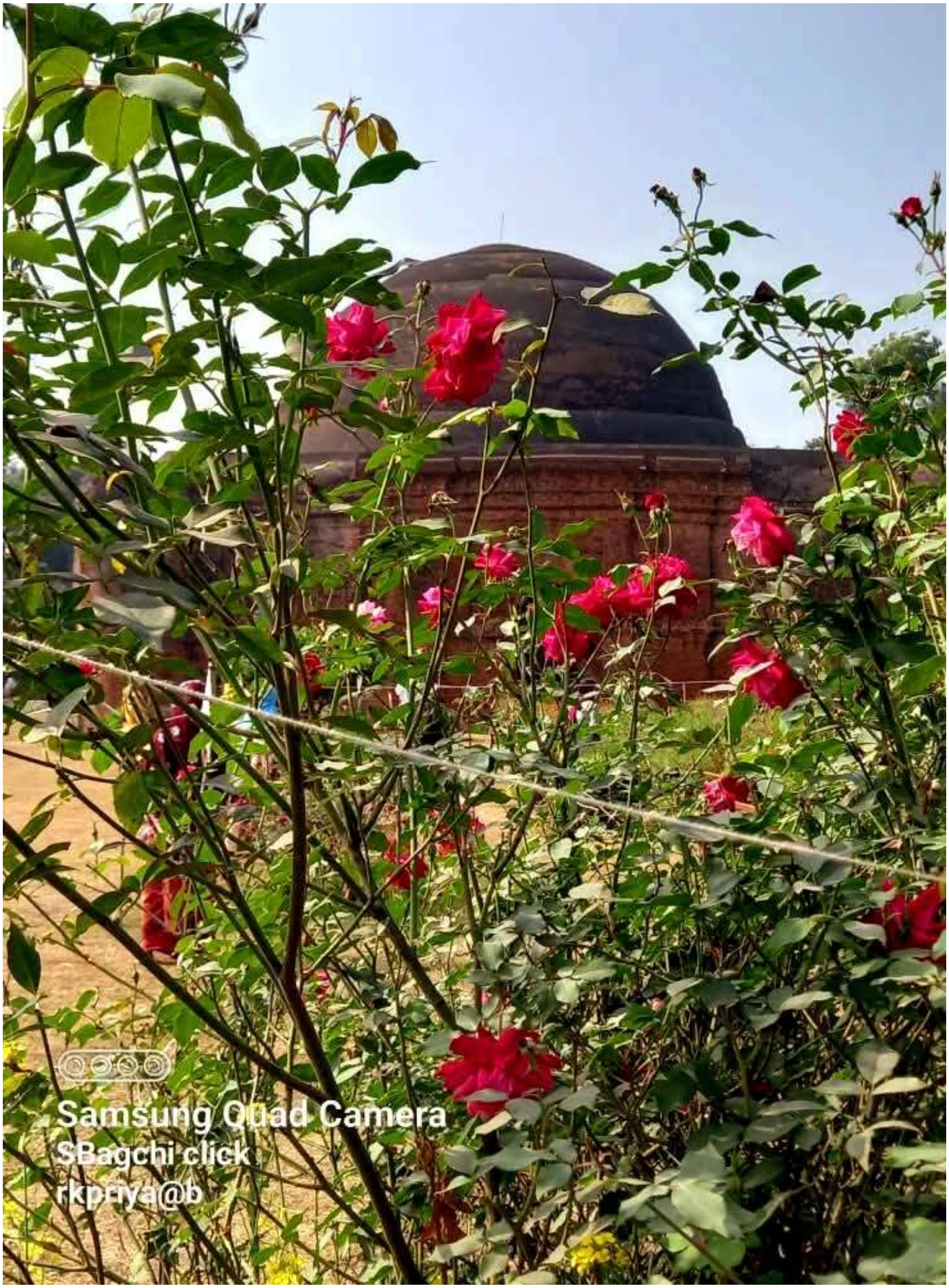
মসজিদের ইসলামিক স্থাপত্য



অদ্ভুত আকৃতির এই গাছের কান্ড



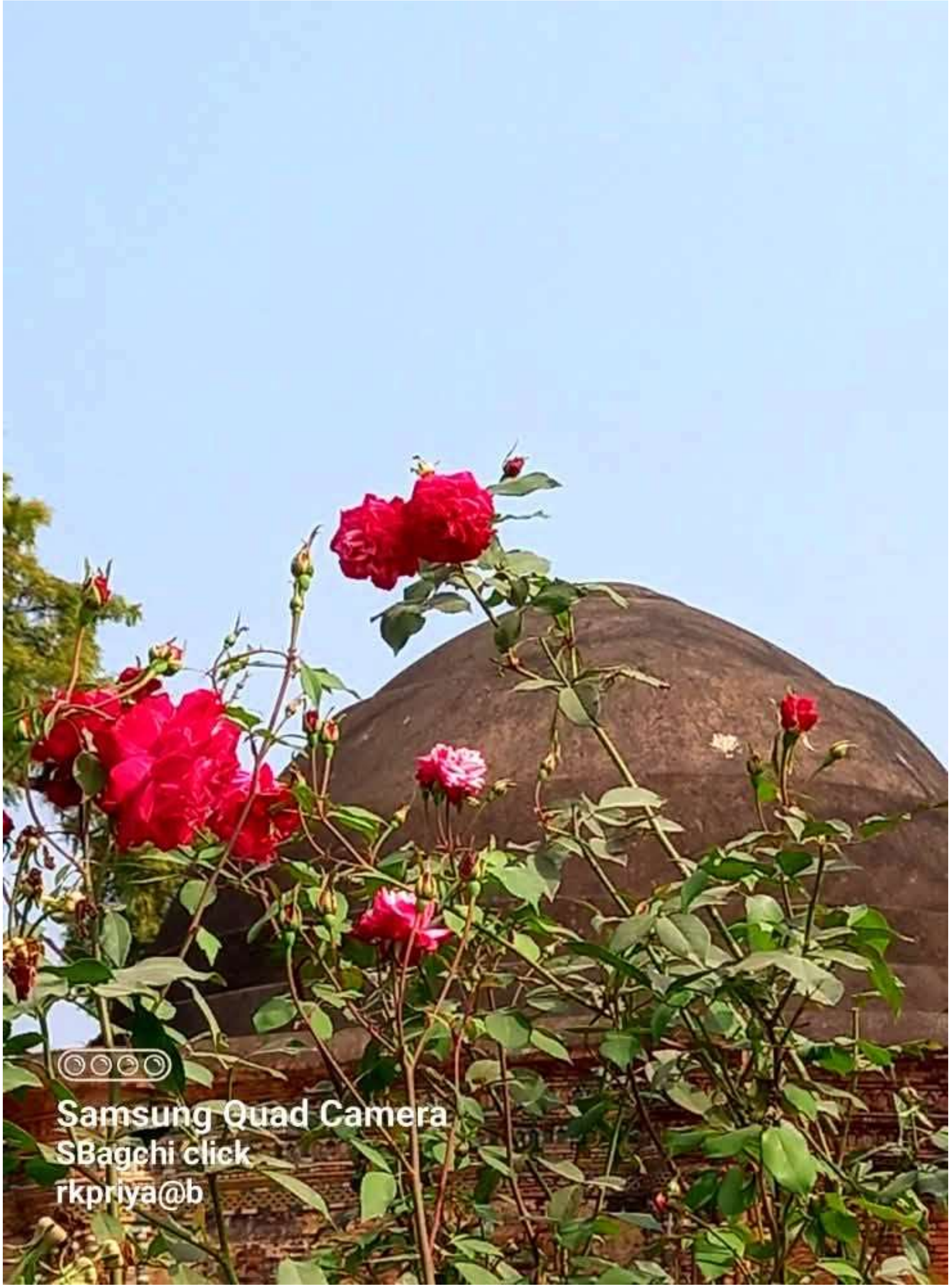
গোলাপ বাগের মধ্যে দিয়ে চিকা মসজিদের গম্বুজ



ফুলের রানী



দয়া করে ফুল তুলিবেন না, বাগিচার সৌন্দর্য্য বজায় রাখা আপনার, আমার দায়িত্ব 🙏🙏



নানাধরনের গাছ এই চত্বরে দেখা যায়



Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 2w
স্থাপত্য তো সুন্দরই, কিন্তু প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ইমারত, মন্দির ইত্যাদিকে জড়িয়ে যে মিথগুলি কথিত আছে, তা খুব ভালো লাগে। সুন্দর পোস্ট।
Reply Share

Nivedita Raha · 2w
খুব সুন্দর💛
Reply Share

Gunjan G Traveler · 3w
মূল্যবান তথ্য, ছবিগুলো চমৎকার, ছবিতে দেখা যাচ্ছে বৈশিষ্টময় স্থাপত্য , সুন্দর লাগছে এই উপস্থাপনা।
Reply Share

সুচিপত্র

কুমায়ুনের ডাকে - পর্ব ১

আলমোড়া – ১

জয়তী সেন



Jayati Sen

কুমায়ুনের ডাকে - পর্ব ১

আলমোড়া ১

কদিন ধরেই ভাবছিলাম বছরের প্রথম ছয় মাস চলে গেল প্রায় এবার আর বেরোনো হলনা! মন উসখুস করছে কিন্তু উপায় নেই। যা সাংঘাতিক গরম সারা দেশ জুড়ে, কোথায় বা যাব! জীবনে কোনদিন বোধহয় এত মন দিয়ে আবহাওয়ার খবর শুনিনি , বৃষ্টির দেখা নেই, হলেও বলছে কমই হবে। যায়ে তো যায়ে কাঁহা! দুত্তোর এই গরমে আর কোথায় যাচ্ছিনা এটাই মনে মনে স্থির করে নিলাম বলা ভালো মন কে স্তোকবাক্য শুনালাম এই সময় ঘুরতে না যাওয়াই ভাল, শীতের সময় যাওয়া যাবেখন। তো এইরকম জোর করে মনকে উপোসী রেখে রোজই প্রায় ভ্রমণ Vlog দেখি, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। সারা জুন মাস ধরে এই চলছিল। হঠাৎই একটি ফোন কলে আমন্ত্রন পেলেন কর্তামশাই আলমোড়া যাবার। ন'দাদুর(বশী সেন) প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ পার্বতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থার (VPKAS) ১০৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ। যাওয়া স্থির হতে না হতেই হুড়মুড় করে সুটকেস,বাক্স প্যাঁটরা যে যেখানে ছিল এক লাফে সার সার দাঁড়িয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য টেনে নামালাম। ঝিমিয়ে,নেতিয়ে থাকা প্রাণ এক নিমেষে তাজা! উর্দ্ধ গগণে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল অরুণ প্রাতের তরুণদল চল রে চলরে চল! কোথায় গরম! কোথায় বর্ষা আসছে! কে করে তার বিচার!দ্বিতীয়বার আলমোড়া যাবার সুযোগ কে হেলায় ফেরায়? চটপট পুনে- দিল্লি- পন্থনগর রুটের প্লেনের টিকিট কেটে ঘোর বর্ষাকালে ছাতা বগলে সপরিবারে চললাম আলমোড়া। ঠিক করলাম গতবছর যে জায়গাগুলো দেখা হয়নি সেগুলো দেখতে যাব। তাই এবারের সফরে আমাদের তালিকায় জুড়ল রাণীক্ষেত, বিনসর এবং মুক্তেশ্বর।

পুনে থেকে দিল্লি হয়ে যখন পন্থনগর পৌঁছুলাম তখন আমাদের আলমোড়া নিয়ে যেতে গাড়ি হাজির। পন্থনগর থেকে আলমোড়ার দূরত্ব ১২১ কিমি। সময় লাগবে প্রায় চারঘন্টা। সারা রাত ধরে না ঘুমিয়ে এয়ারপোর্টের ঝক্কি সামলে যখন গাড়িতে উঠলাম, পাহাড়ি ঘোরানো রাস্তায় যেতে যেতে বারে বারেই

ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে এল। ব্রেকফাস্টের জন্য কিছুক্ষণের জন্য থামলাম ভীমতালে। সেখান থেকে বেরিয়ে ভাওয়ালি-ক্যাঁইচি ধাম রুট ধরে চললাম আলমোড়ার পথে কোসি নদীকে বাঁদিকে রেখে। আলমোড়ায় পৌঁছুলাম দুপুর দেড়টা নাগাদ।

সেদিন পুরোটাই বিশ্রাম করলাম আর যেখানে উঠলাম সেই VPKAS এর গেস্ট হাউস এমনই সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা মন্ডিত স্থানে অবস্থিত এবং এমনই দৃষ্টিনন্দন,পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস যে সেখানে বসেই আলমোড়ার সৌন্দর্য, পাহাড় পর্বত,উপত্যকা, সূর্যাস্ত সবই উপভোগ করা যায়। মল রোডের পাশেই অবস্থিত এই ক্যাম্পাসে রয়েছে গাঢ় সবুজ বিশালাকার দেওদার বৃক্ষ, পাইন,ইত্যাদি coniferous tree সামনে ঢেউ খেলানো পার্বতীয় উপত্যকা বা rolling hills। মেঘমুক্ত আকাশ থাকলে দূরে Himalayan range এর অনেক পর্বত শৃঙ্গ যেমন নন্দা দেবী, পঞ্চাচুল্লি সবই স্পষ্ট দেখা যায়। গত বছরই জুনের এক আলো ঝলমল সকালে বহুক্ষণ ধরে হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গ দৃশ্যমান ছিল এবং বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিলাম। এবারে বর্ষার আগমনের ঘন্টা বেজে যাওয়ায় মেঘ রোদের লুকোচুরি সমানে চলছিল তাই ক্যামেরা রেডি থাকলেও হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গ আলমোড়ায় দেখা দেয়নি।

এই ক্যাম্পাসটাতেই একসময় ন'দাদু তাঁর ল্যাবরেটরী কলকাতা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ১৯২৪ এ পাকাপাকিভাবে। সেই মূল ল্যাবরেটরি যেখানে দাদু বসে কাজ করতেন সেটা এখন হেরিটেজ ল্যাবরেটরি, রয়েছে অফিস এবং মিউজিয়াম। আর আরেকটা ফিল্ড লাবরেটরি রয়েছে হাওয়ালবাগে, সেটাও ৮৫ একর জমি নিয়ে । এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছিলাম আমার দেবভূমি ভ্রমণের ব্লগে।

পরদিন আলমোড়া শহরের ইতিহাসের খোঁজে চলে গেলাম মাল্লা মহল দেখতে। মল রোডের একপাশ দিয়ে বেশ খাড়া সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। একে পাহাড়ি শহর, এদিক ওদিক যেতে গেলেই সিঁড়ি ভাঙ্গার কঠিন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে! মাল্লা মহল যাবার মূল গেট রয়েছে থানা বাজার রাস্তায়, খাজাঞ্চি মহল্লা দিয়ে। তবে থানা বাজার দিয়ে যেতে হলে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চড়তে হয়। যাইহোক, "বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই থামলে তো আর চলবেনা/ হিমালয়ের বরফ জেনো ঘামবে তবু গলবেনা"! একপা এগোই দুপা থামি, আশপাশের হাট্টা গাট্টা, লিকপিকে, আধ বুড়ো, ফুল বুড়ো, স্থানীয়, দেশীয় সব ধরণের আম আদমি আমার আগে চলে গেল, আমি রয়ে সয়ে সিঁড়ি চড়ি। ধীরে ধীরে পৌঁছাই প্রবেশ দ্বারে। (চলবে)

VPKAS ক্যাম্পাস থেকে



VPKAS ক্যাপাস থেকে



দেওয়াল চিত্র


ICAR - VPKAS, ALMORA
हार्दिक स्वागत
HEARTY WELCOME
सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा
स्वागतम

মল রোড থেকে



রাস্তার ধারে



রাস্তার ধারে





আলমোড়ার ঢেউ খেলানো পাহাড়



Selected Comments

Gunjan G Traveler · 1w
আগেই ব্লগে লেখাটি পড়েছিলাম, আবার পড়লাম। সত্যিই দারুণ লাগল। আপনার সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি লেখাটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করে তুলেছে। ছবিগুলিও সমানভাবে সুন্দর ও মনকাড়া—লেখার সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করি, আপনার এই ভ্রমণ-লেখাগুলি আমার মতো ভ্রমণপিপাসু পাঠকের মনকে সমৃদ্ধ ও তৃপ্ত করবে। আগামী পর্বগুলোর অপেক্ষায় রইলাম। পোষ্ট করার জন্যে আশেষ ধন্যবাদ।

Reply Share

Jayati Sen · 1w
Gunjan G Traveler অসংখ্য ধন্যবাদ।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 1w
খুব সুন্দর ভ্রমণ কথা ও ছবি। ভালো লাগল।

Reply Share

সুচিপত্র

কুমায়ুনের ডাকে - পর্ব ২

আলমোড়া - ২



জয়তী সেন

Jayati Sen

কুমায়ুনের ডাকে - পর্বঃ ২

আলমোড়া ২

কুমায়ুনের রাজাদের রাজবাড়ি মাল্লা মহল তৈরি হয়েছে আনুমানিক ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে । রাজাদের আবাসস্থল এবং দরবার হিসেবে এর নির্মাণ করেন চাঁদ বংশের রাজা রুদ্র চাঁদ । ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে গোর্খাদের কাছে চাঁদ বংশ পরাজিত হলে এই মহলের দখল নেয় গোর্খারা এবং প্রায় পঁচিশ বছর পরে ইংরেজরা যুদ্ধে গোর্খাদের হারালে ১৮১৫ থেকে এই মহল চলে যায় ইংরেজদের দখলে । প্রশাসনিক কাজে এই মহল ব্যবহার করা হত। কাঠ আর পাথরে তৈরি এই রাজমহলে কুমায়ুনি স্থাপত্য ও নক্সার ছাপ সর্বত্র। মহল চত্বরে রয়েছে রাম শিলা মন্দির। ঘুরে ঘুরে এদিক ওদিক ছবি তুললাম কিন্তু মহলের কক্ষের মধ্যে ঢোকার প্রবেশাধিকার নেই। একটা লাইট এন্ড সাউন্ড শো করা হয় সন্ধ্যে বেলায় কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা উপভোগ করার সুযোগ বা সময় কোনোটাই হলোনা। অন্যান্য প্রদেশের রাজাদের মহল বা প্রাসাদের তুলনায় এই প্রাসাদের পরিসর অনেকটাই ছোট কিন্তু মনোরম। অবস্থানগত কারণে মাল্লা মহলের সুউচ্চ চত্বর থেকে আলমোড়া শহরের একটা সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে।

মাল্লা মহলের মূল ফটক যেটা থানা বাজার এলাকার খাজাঞ্চি মহল্লার দিকে রয়েছে, সেখান থেকে সামান্য এগোলেই স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য লালা বদ্রী শাহের বাড়ি। খাজাঞ্চি মহল্লা বা এলাকার বাড়িগুলোতে কুমায়ুনি সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ। কাঠের দরজা জানালা খুবই বর্ণময়। সরু গলির দুপাশে অজস্র ছোট বড় দোকান। মনে হল টাইম ট্রাভেল করে পৌঁছে গেছি এক পুরোনো শহরে, সময় যেন থমকে গেছে, ছোট ছোট খোপ খোপ জানালার ওধারে যেন অনেক গল্প, অনেক কথা জমে রয়েছে। এই মহল্লাতেই রয়েছে রঘুনাথ মন্দির, যার সামনে ১৮৯৭ এ বিদেশ প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং স্বামীজী আলমোড়াবাসীদের সামনে বক্তৃতা দেন।

খাজাঞ্চি মহল্লা থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে আলমোড়া বাজারের অন্য প্রান্তে,সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আলমোড়ার দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার এক ঝলক দেখলাম,চোখে পড়ল তাজা শাক সব্জির বাজারে একটা ডালায় রাখা ঢেঁকি শাকের আঁটি, কিন্তু তার সাইজ বেশ তাগড়াই। এমনতর আগে দেখিনি। এখানে একে

বলা হয় লিংগুড়া , ইংরেজিতে যাকে বলে Fiddlehead fern। পাহাড়ি অঞ্চলের এই শাক আমাদের পূর্বোত্তর রাজ্য গুলোতেই মেলে এবং অত্যন্ত স্বাদু এবং বলার অপেক্ষা রাখেনা আমার অত্যন্ত প্রিয়। আলমোড়ায় এর দেখা পাওয়া অপ্রত্যাশিত ছিল। কিছু কিছু জিনিষ আছে যার সঙ্গে অনেক সুখ স্মৃতি, গন্ধ, গল্প জড়িয়ে থাকে ,সেগুলো trigger এর কাজ করে।

থানা বাজার থেকে বেরিয়ে চলে এলাম মল রোডে বিখ্যাত খীম সিং মোহন সিং রৌতেলার মিষ্টির দোকানে সিংগোরি মিষ্টির আস্বাদ নিতে। কাঞ্চন ফুল গাছের পাতায় মোড়া নরম ক্ষীরের মিষ্টি। আলমোড়ার বিখ্যাত দুটি মিষ্টি-সিংগোরি আর বাল মিঠাই। বাল মিঠাই কড়া পাকের মিষ্টি,বহুদিন ভাল থাকে, কিন্তু সিংগোরি বড়জোর এক দুইদিন । সিংগোরির মিষ্টত্ব বাল মিঠাই এর থেকে কম,আর নরম মিষ্টি বলে আমার বেশ লাগল।

গতবারের সফরে সিস্টার নিবেদিতার স্মৃতিধন্য বাড়িটি দেখা হয়ে ওঠেনি, তাই এবার ঠিক করেছিলাম সেই বাড়িটি দেখে আসব। আমাদের গেস্ট হাউস থেকে পাঁচ মিনিট হেঁটেই পৌঁছে গেলাম। দেওদার গাছে ঘেরা ওকলে হাউস, বর্তমানে এর নাম নিবেদিতা কটেজ। এখানে এখন লালা বদ্রী শাহের উত্তরপুরুষররা থাকেন(জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাতির পরিবার) এবং তাঁরা একটি গেস্ট হাউস "দেওদার হলিডে ইন" পরিচালনা করেন। এই কটেজের চত্ত্বরেই রয়েছে সিস্টার নিবেদিতার মূর্তি যা মল রোড থেকে দেখা যায়। ১৮৯৮ এর মে মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তৃতীয়বার যখন আলমোড়া আসেন তখন সঙ্গে এসেছিলেন কয়েকজন বিদেশিনী শিষ্যা। তাঁরা হলেন সিস্টার নিবেদিতা, মিস ওলে বুল, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং মিসেস প্যাটারসন। এনারা লালা বদ্রী শাহের এই বাড়িতে ১৭ই মে থেকে ১১ই জুন পর্যন্ত ছিলেন।

সিস্টার নিবেদিতার লেখা "Notes of some wanderings with Swami Vivekananda" এর Morning talks at Almora অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে কাটানো সেই সব দিনের ঘটনা, স্বামীজি গল্পোচ্ছলে নানা বিষয়ের ওপর যে আলোচনা করতেন, সাধারণ বিষয় থেকে শুরু করে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ইতিহাস, বা সমকালীন বিষয় নিয়ে যেসব গভীর আলোচনা করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। কখনও মানবসভ্যতা, ভারতের ইতিহাস, চীন বা ইতালির গল্প,আর্যদের পরিচয় বা ভগবান বুদ্ধদেবকে নিয়ে আলোচনা করেছেন বা কখনও শিষ্যাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পুরাণের গল্পের সঙ্গে। বাংলার নবজাগরণের মনীষীদের চিনিয়েছেন। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে চিনিয়েছেন। এরকম বহু গল্পের উল্লেখ করেছেন সিস্টার নিবেদিতা। প্রচন্ড ও প্রখর অনুশীলনে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত শিষ্যাদের মধ্যে সংশয় এসেছিল। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ ছিলেন সিস্টার নিবেদিতাও। তাঁকে ২৫শে মে সন্ধ্যেবেলা এক দেওদার গাছের নীচে আশীর্বাদ করলেন স্বামীজি। মনের সব দ্বন্দ্ব এক নিমেষে ঘুচে গেল এবং ভারতবর্ষের সেবায়

সেদিন নিবেদিতাকে অর্পণ করলেন স্বামীজি। সেই দেওদার গাছ এখন সুবিশাল বৃক্ষ এবং এর তরুমূলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সিস্টার নিবেদিতার মূর্ত্তি ।

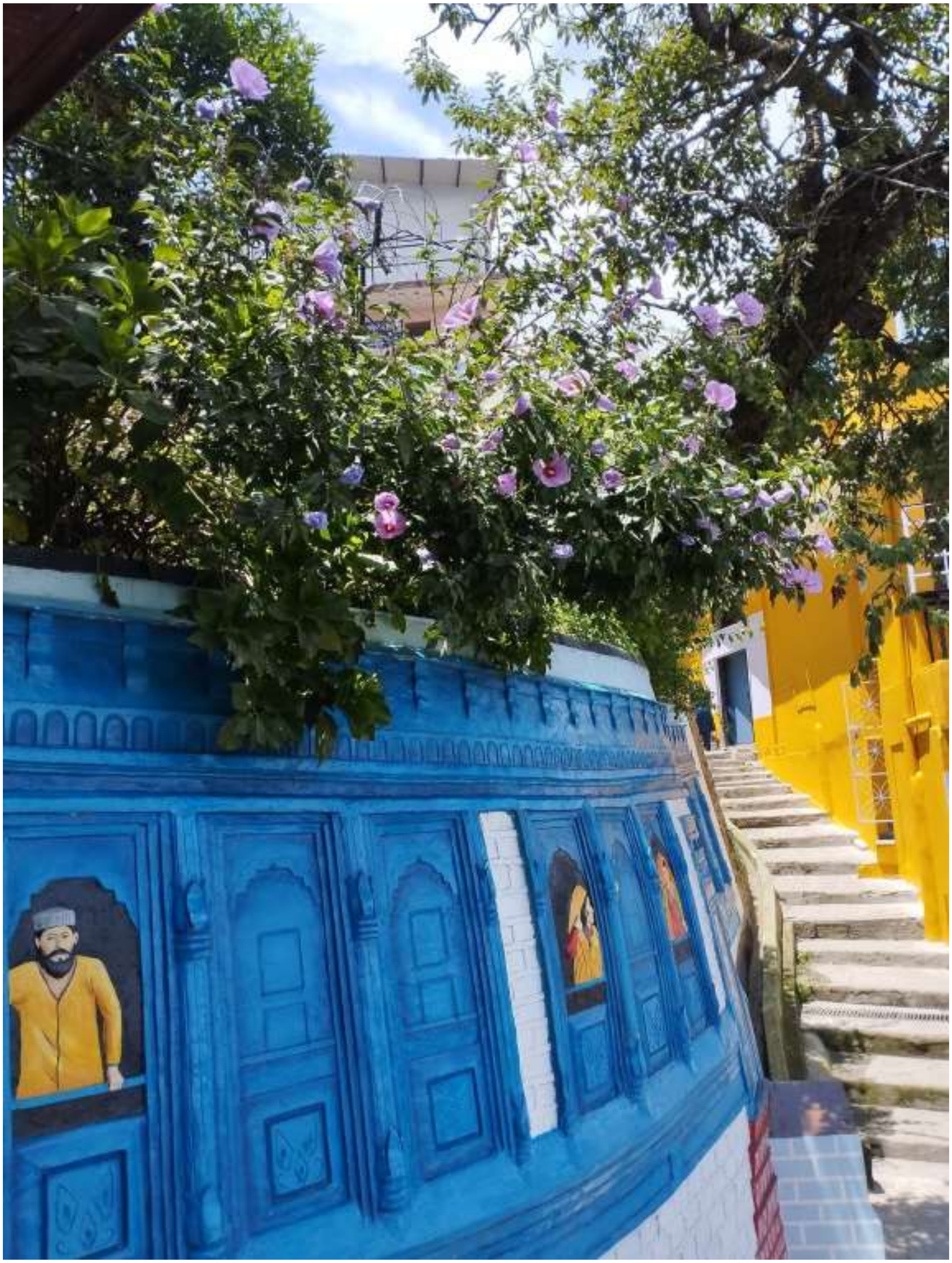
পরিবেশ মাহাত্ম্যে আপনাআপনিই এই জায়গায় এলে মন উদাস হবেই।

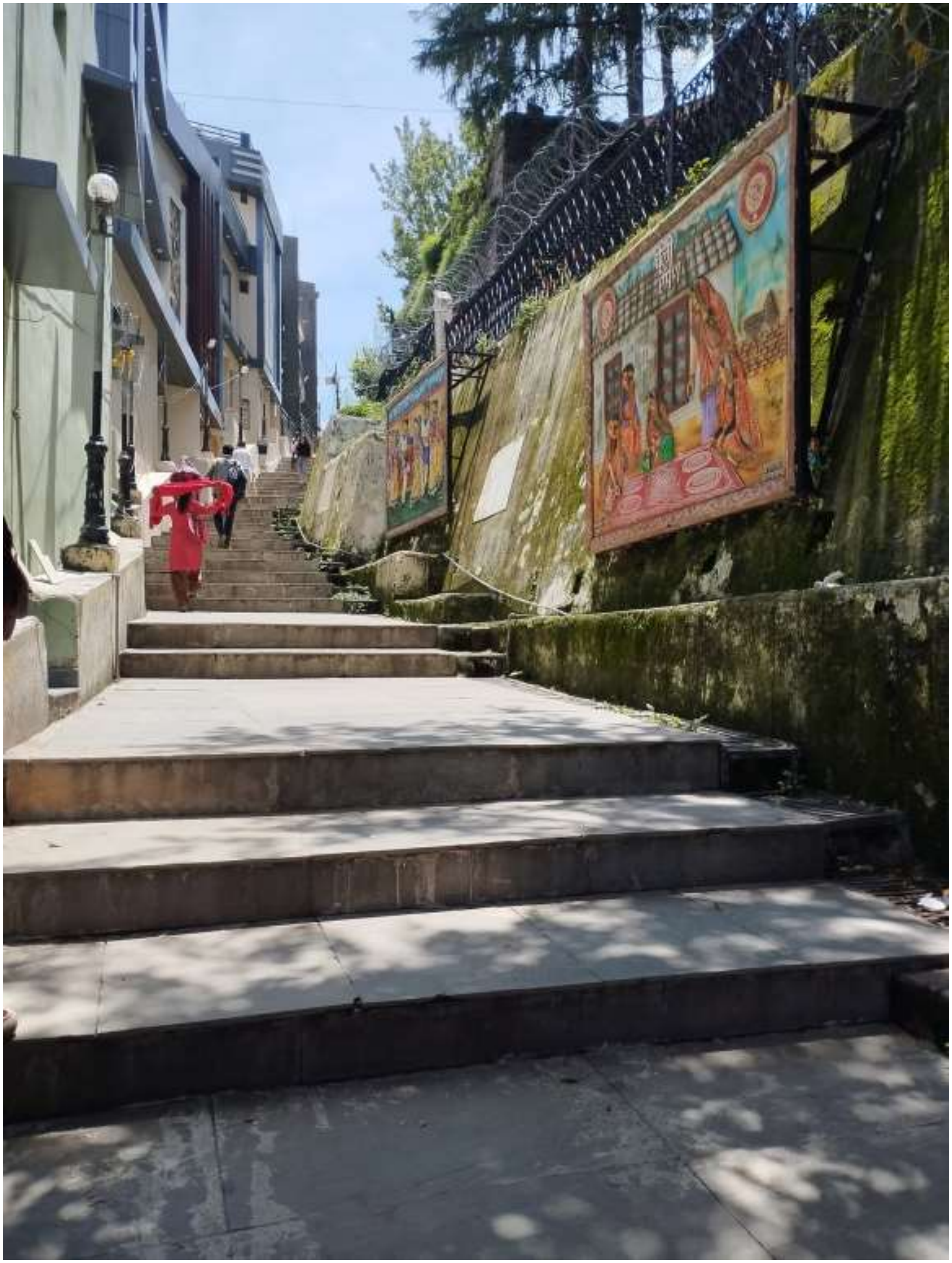
আমার মনে হল সেই মহীয়সীর কথা যিনি তাঁর দেশ, আপনজন, সব কিছু ছেড়ে ভারতীয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে, স্বামী বিবেকানন্দের মত এক তেজোময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ অজানা এক দেশে চলে এলেন, দেশটা কে আপন করে নিলেন এবং জীবন অতিবাহিত করলেন জনসেবায়। আমাদের সাধারণ মেধায় বুদ্ধিতে সেই অগ্নিকণ্যার আত্মিকশক্তি বা জীবন দর্শন বা intellect কতটুকুই বা বুঝতে পারি? ২০২৬ এর আলমোড়ার পাহাড়ি রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে বোঝা যায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে গাড়িতেই কতখানি সময় লেগে যায়,তারপর রয়েছে পাহাড়ে ধস নামা, কোথাও কোথাও রাস্তার ভগ্ন দশা এবং চড়াই উৎরাই। কিন্তু ১৮৯৮ এর আলমোড়ায় এখনকার স্বাচ্ছন্দ্য তো কিছুই ছিলনা, ছিলনা বিদ্যুৎ, জলের উৎসও অপ্রতুল। এত প্রতিকুলতার মধ্যেও তাঁরা থেকেছেন, ঘুরেছেন, আধ্যাত্মিক জীবনের সাধনা করেছেন। সেই জীবনের কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়।

কথা বলেছিলাম লালা বদ্রী শাহের প্রপৌত্রের স্ত্রী ইন্দু শাহের সঙ্গে। সিস্টার নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি চিহ্ন, স্মারক সব একজায়গায় একত্রিত করে মিউজিয়াম করে রেখেছেন একটা ঘরে। এখানে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত ইজিচেয়ার, একখানি ছোট খাট, সোফা, চেয়ার,কিছু ল্যাম্প, পেতলের গড়গড়া , গ্লাস কিছু চিঠিপত্র ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত বলি, সিস্টার নিবেদিতার লেখাতে উল্লেখ পাই যে স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময় এই বাড়িতে সকালের দিকে আসতেন, প্রাতঃরাশ করতেন, বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন,প্রাচীন গুরুকুলের মত ঘন্টার পর ঘন্টা সেই আলোচনায় অন্তর্নিহিত থাকত অধ্যাত্ম চেতনা। আবার সন্ধ্যেবেলা চলে যেতেন নিকটবর্ত্তী থম্পসন হাউসে । কখনও বা জঙ্গলে বা পাহাড়ে ধ্যান করতে বেড়িয়ে যেতেন আবার দু তিন দিন পরে আসতেন। দুশো বছরের পুরনো এই বাড়িটির চেহারা অনেকটাই বর্তমানে বদলে গেছে। আলমোড়ার রামকৃষ্ণ কুটিরের ওয়েবসাইটে পুরাতন ফটোগ্রাফের সংগ্রহ থেকে পেয়ে গেলাম ওকলে হাউসের পুরনো ছবি। দেওদারে ঘেরা শান্ত নির্জন নিবেদিতা কটেজকে বিদায় জানিয়ে চললাম ব্রাইট এন্ড কর্ণারে সূর্যাস্তের সাক্ষী হতে। বিস্তীর্ণ পাহাড়ের মাঝে অপরূপ এক শান্ত সমাহিত সুর্যাস্ত দেখলাম, বহুক্ষণ বসে রইলাম ।ফেরার তাড়া নেই, কাজের ভার নেই ,শুধু অপার শান্তির অনুভব । (চলবে)

মাল্লা মহলের প্রবেশ পথে





মাল্লা মহল



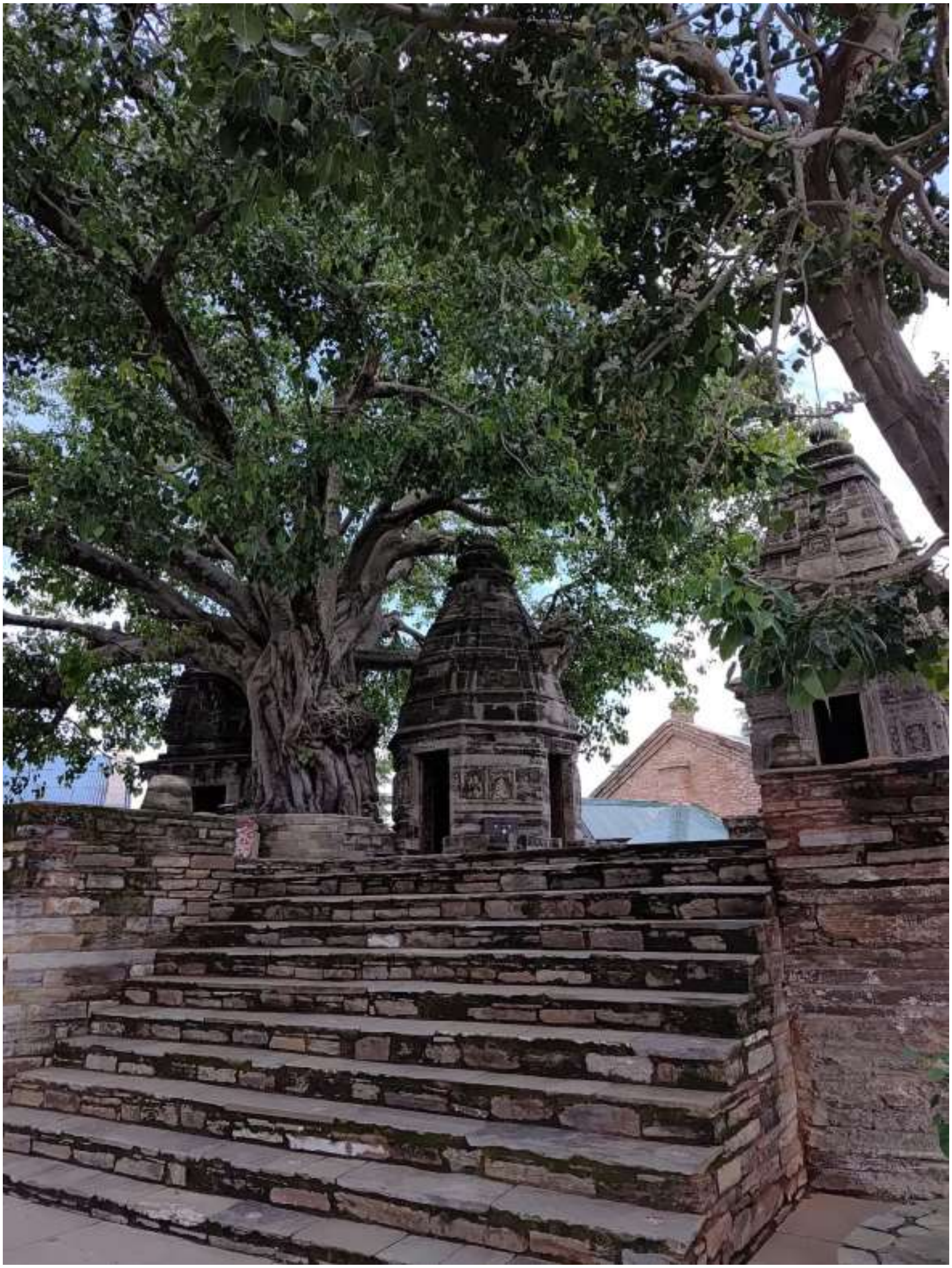
মাল্লা মহল



মাল্লা মহল



রাম শিলা মন্দির



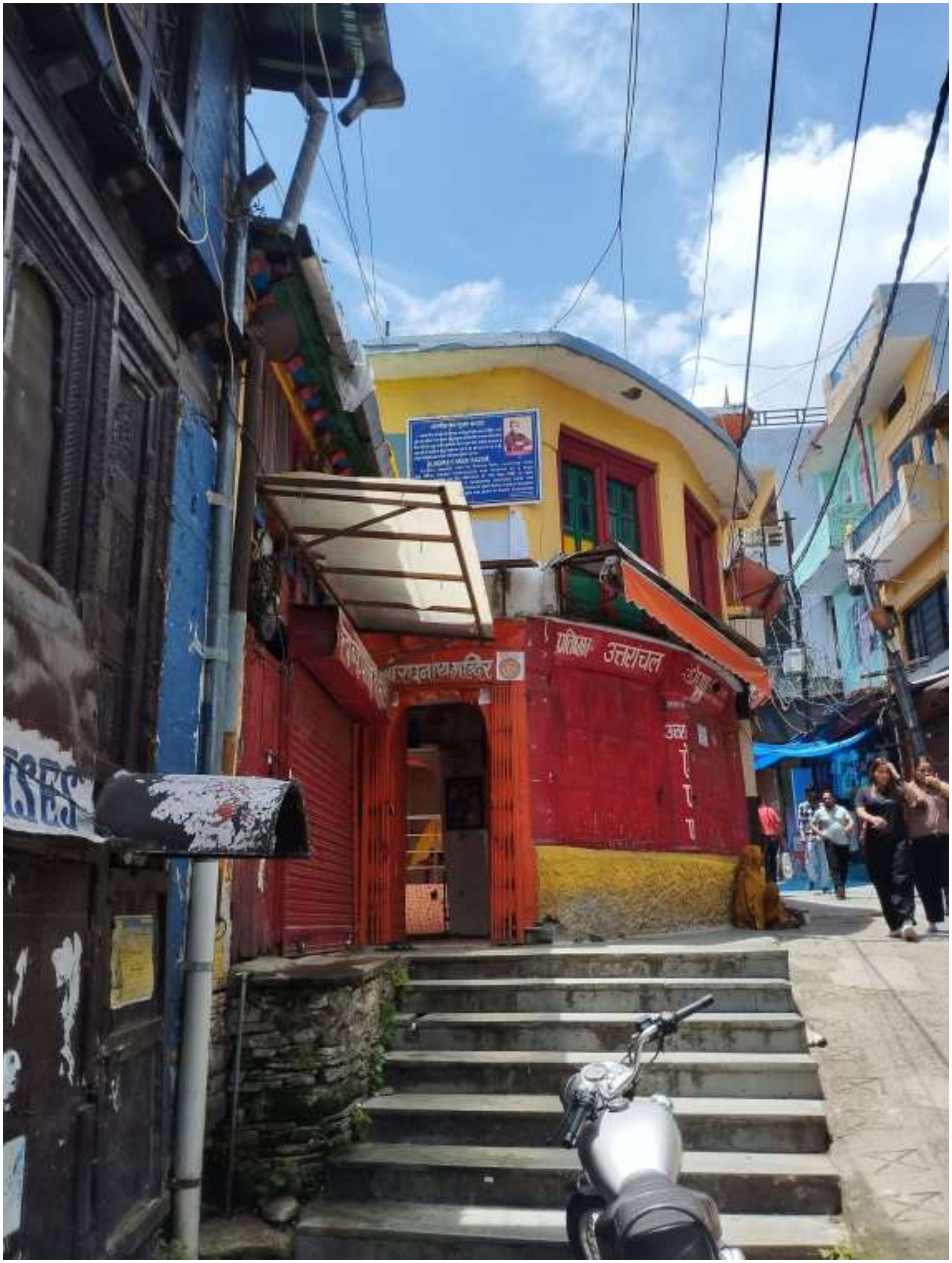
রাম শিলা মন্দির



মাল্লা মহল



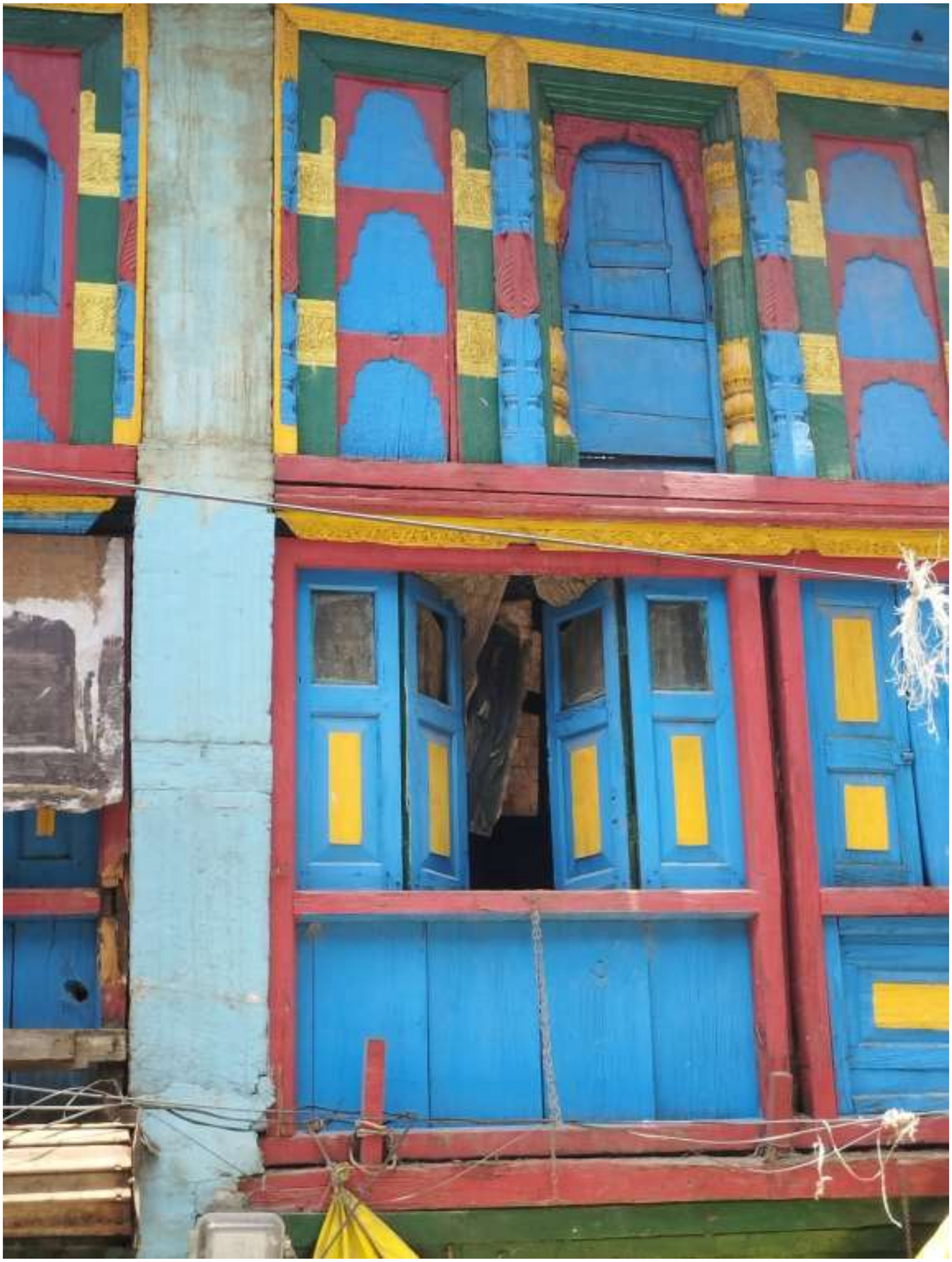
রঘুনাথ মন্দির, খাজাঞ্চি মহল্লা



খাজাঞ্চি মহল্লা, থানা বাজার, আলমোড়া



বর্ণময় কুমায়ুনি বাড়ি, থানা বাজার



প্রখ্যাত মিষ্টান্ন বিক্রেতা



সিংগোরি



নিবেদিতা কটেজের গেট



নিবেদিতা কটেজ



ওকলে হাউস/নিবেদিতা কটেজ(চিত্র সৌজন্যেঃ রামকৃষ্ণ কুটির আলমোড়া পুরোনো ছবি সংগ্রহ)



নিবেদিতা কটেজ /দেওদার হলিডে ইন



সিস্টার নিবেদিতা



Selected Comments

Gunjan G Traveler · 1w
আপনার লেখা যতই পড়ছি, ততই মুগ্ধ ও তৃপ্ত হচ্ছি। রাজার মহল থেকে শুরু করে সেখানকার শাকসবজি, স্থানীয় মিষ্টি—সবকিছুর প্রাণবন্ত বর্ণনা আপনার লেখাকে একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণকাহিনির রূপ দিয়েছে।

আলমোরা অনেকেই ঘুরতে যান, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেই ঐতিহাসিক স্মৃতির খোঁজ ক'জনই বা রাখেন! আপনার লেখার মাধ্যমে সেই অমূল্য তথ্যগুলো জানতে পেরে সত্যিই সমৃদ্ধ হলাম।

লেখাটি পড়তে পড়তে আবার আলমোরা যাওয়ার ইচ্ছেটাও নতুন করে জেগে উঠল। এমন তথ্যসমৃদ্ধ, অনুভূতিপূর্ণ ও মনোগ্রাহী ভ্রমণকাহিনি আমাদের এই গ্রুপকে নিঃসন্দেহে আরও সমৃদ্ধ করছে।

এত সুন্দর লেখা উপহার দেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ। আগামী পর্বগুলোর অপেক্ষায় রইলাম।

Reply Share

Jayati Sen · 1w
Gunjan G Traveler আপনার এই সুন্দর কমেন্টের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবাই তো ভ্রমণ কাহিনী পড়েনা,তাই নিজের ভালোলাগা থেকেই নিজের ব্লগে লিখি । হঠাৎ এই গ্রুপ টা পেলাম। ভ্রমণের গল্প পড়ব বলে এলাম। আপনাদের ভালো লাগছে জেনে আমিও লেখার উৎসাহ পাচ্ছি। গত বছর লিখেছিলাম আলমোরার অন্যান্য কাহিনী আমার দেবভূমি ভ্রমণের সপ্তম পর্বে। কখনও শেয়ার করার ইচ্ছে রইল।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 1w
কোনো এক যাত্রাপথে আলমোড়া ছুঁয়ে এসেছিলাম। সিস্টার নিবেদিতা লিখিত একটি বইয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর সাক্ষাৎ নিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু এত বিশদে জানতাম না। আপনার পোস্টটি পড়ে ঋদ্ধ হলাম। অনেক অজানা কথা জানতে পারলাম। সঙ্গের ছবিগুলো অবশ্যই এক দুর্লভ প্রাপ্তি। অনেক ধন্যবাদ এমন একটি পোস্ট শেয়ার করার জন্য। আরও পর্বের জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

Reply Share

Jayati Sen · 1w
Ghosh Ruchismita আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। ধন্যবাদ।

Brihot Bongo · 5d
সুন্দর বিবরণ! আলমোড়াতে বিদেশিনী শিষ্যাদের নিয়ে স্বামীজীর ভ্রমণের কথা আগে পড়েছিলাম, ছবিও দেখেছি। কিন্তু এই নিবেদিতা কটেজটির কথা জানতাম না। ভারতে কলকাতা ও দার্জিলিং-এর বাইরেও এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিচিহ্ন আছে জেনে ভালো লাগল!

Reply Share

Jayati Sen · 5d
Brihot Bongo অসংখ্য ধন্যবাদ । অনেক তথ্য আর ছবি আলমোড়ার রামকৃষ্ণ কুটিরের ওয়েবসাইটে পাবেন ।

Reply Share

সুচিপত্র

কুমায়ুনের ডাকে – পর্ব ৩
রানিখেত - কাটারমল – সূর্যমন্দির



Jayati Sen

জয়তী সেন

কুমায়ুনের ডাকে - পর্ব ৩

রানিখেত - কাটারমল - সূর্যমন্দির

মন্দিরময় উত্তরাখন্ড, যেদিকে যাও সেদিকেই মন্দির, ছোট বড়, কোথাও বা পাহাড়ি মোড়ের বাঁকে কোথাও বা পাহাড় চুড়ায়। সকাল সকাল গাড়ি ছুটে চলেছে আলমোড়া ছেড়ে রাণীখেতের দিকে। শৈল শহরটার এত নাম শুনেছি ভাবলাম এতদূর এসেছি যখন এক ঝলক দেখেই আসি। যদিও জানি ক্যান্টনমেন্ট শহর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে কিন্তু দর্শণীয় স্থানের সংখ্যা কম, তবুও নতুন জায়গা বলে কথা। চললাম পাহাড়ি সর্পিল রাস্তা ধরে, পাশে পাইন বন। ঋজু, উত্তুঙ্গ বৃক্ষের সারি। দুপাশের বিশাল গলফ গ্রাউন্ডের মাঝখান দিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ছবি তোলার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে গেলাম, গাড়ি থামাবার অনুমতি নেই। গাড়ির গতি ধীরে করতেই বাঁশি বাজিয়ে গার্ড ছুটে এল। অগত্যা আধে অধুরে খাহিশ নিয়ে এগিয়ে চললাম। গন্তব্য ঝুলা দেবীর মন্দির।

দেবী দুর্গা প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের বিশেষত্ব হল স্বপ্নাদেশ অনুসারে মা দুর্গা ঝুলায় বা দোলনায় অধিষ্ঠিতা। পাশেই চৌবাটিয়া জঙ্গল,আর এই জঙ্গলের জন্য সাতশ বছর আগে বন্য জন্তু জানোয়ারের আক্রমণে আশপাশের গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে থাকত তাদের গবাদি পশু নিয়ে। এক রাখাল স্বপ্নাদেশে মায়ের মূর্তির সন্ধান পায়, মা স্বয়ং দেখা দিয়ে বলেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে তাহলে সব সমস্যার সমাধান হবে।আর তারপর থেকেই পূজিত হন দেবী। পরে ১৯৩৫ এ এই মন্দির প্রাঙ্গণ তৈরি হয়। ছোট্ট এই মন্দির প্রাঙ্গনে অসংখ্য ঘন্টা বাঁধা। ভক্তরা মনস্কামনা জানিয়ে বাঁধেন। আমার চোখে তো সকলই নবীন তাই সামান্য, অসামান্য যাই দেখি চমৎকৃত হই, ছবি তুলে রাখি।

মন্দিরের গা ঘেঁষেই চৌবাটিয়া ফরেস্ট এলাকা, এখানে বিরাট বিরাট সব ফলের বাগান বা orchard। যেহেতু ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, তাই পদে পদে অনুমতি লাগে। যতই ভেতরে গাড়ি যেতে থাকে দেখি ঘন

জঙ্গল দুপাশে, বেশ খানিক্ দূর গেলে পৌঁছাই orchard এর প্রবেশ মুখে। একদিকে ঘন জঙ্গলের পথ, অন্য দিকে মেঠো রাস্তা। তারপর অল্পবিস্তর খাড়া পাহাড়ি টিলা ভুমি/ঢাল দিয়ে নেমে যেতে হয় ফলবাগানে। প্রায় ৬০০ একর জুড়ে এই বাগান,দূর থেকে দেখলাম আপেল পিচ,প্লাম এপ্রিকট বা খুবানির বাগান। সবটা ঘুরে দেখতে প্রচুর সময় প্রয়োজন, সারাদিন ধরে দেখলেও শেষ হবেনা। অগত্যা অভিযান অসমাপ্ত রেখে ফিরে চলি।

ক্যান্টনমেন্ট এলাকা দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল কুমায়ুন রেজিমেন্টের উলেন ফ্যাক্টরি বা KRC woollen। মূলত যুদ্ধে নিহত বীর সৈনিক পরিবারের মহিলাদের জন্য একটা পুনর্বাসন প্রকল্প। মহিলাদের হাতে বোনা, মেশিনে বোনা উলের জিনিষ, ও অন্যান্য অনেক খুঁটিনাটি এখানে পাওয়া যায়। চত্বরে রয়েছে ক্যাফে। জিরিয়ে নিতে বসলাম কিছুক্ষণ। দেওদার গাছের নীচে বসে পুরাতন কুমায়ুনি স্থাপত্য দেখতে দেখতে আয়েশ করে চুমুক দি চায়ের কাপে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি , হাল্কা ঠান্ডা,গরম চা আর খোলা আকাশ, ওয়েস্টার্ন মিউজিকের একটা হাল্কা বিট ভেসে আসছে।এমন পরিবেশে শুধু কেন জানি রাস্কিন বন্ডের লেখার সেই আলসে আমেজটা খালি অনুভব করলাম। এরকম আবেশে বুঁদ হয়ে থাকলে চেয়ার ছেড়ে ওঠা বেশ মুস্কিল।

ফিরতি পথে চললাম সাতটি ঘোড়ার স্বর্ণরথ যাঁর বাহন সেই সুর্যদেবের মন্দিরে। কাটারমল সূর্যমন্দির। সূর্যদেব এখানে পরিচিত বড় আদিত্য নামে। সূর্য বংশীয় কাত্যুরি রাজা কাটারমল আনুমানিক নবম শতাব্দীতে এই সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির চত্ত্বরে মূল মন্দিরের পাশে ছোট বড় ৪৫ টি মন্দির আছে , তবে এই মন্দিরগুলোতে এখন কোন বিগ্রহ নেই, কিছু কিছু মূল মন্দিরে স্থান পেয়েছে। মূল মন্দিরে সূর্যদেব ছাড়াও অন্যান্য সব দেবদেবী এই মন্দিরে পূজিত হন। শিব পার্বতী, লক্ষ্মী নারায়ণ সবাই। মন্দির পৌঁছাতে গেলে অল্প বিস্তর চড়াই চড়তে হয়। বাঁধানো সিড়ি তবে কষ্ট করে ওপরে গেলে সত্যিই মন ভরে যায়। নাম নাগর শৈলীতে গড়া এই মন্দির স্থান মাহাত্ম্যের গুণে মুগ্ধতাই আনে। পূর্বমুখী এই মন্দিরের চারধারে শুধুই পাহাড়। অপূর্ব সুন্দর বিহঙ্গম দৃশ্য। সুর্যদেব তখনও পশ্চিম আকাশে মেঘের আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণেই জানান দিচ্ছেন আমি আছি। চারপাশ ঘুরে ফিরে দেখেও মনে হয় আরো কিছুক্ষণ থাকি। এবার এই পাহাড় থেকে নেমে যেতে হবে অন্য এক পাহাড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সে আছে প্রায় ৭৯১৩ ফিট ওপরে। (চলবে)

ঝুলা দেবী মন্দির, রাণীখেত



ঝুলা দেবী মন্দির, রাণীখেত



চৌবাটিয়া ফল বাগান



চৌবাটিয়া ফল বাগান



KRC woollen



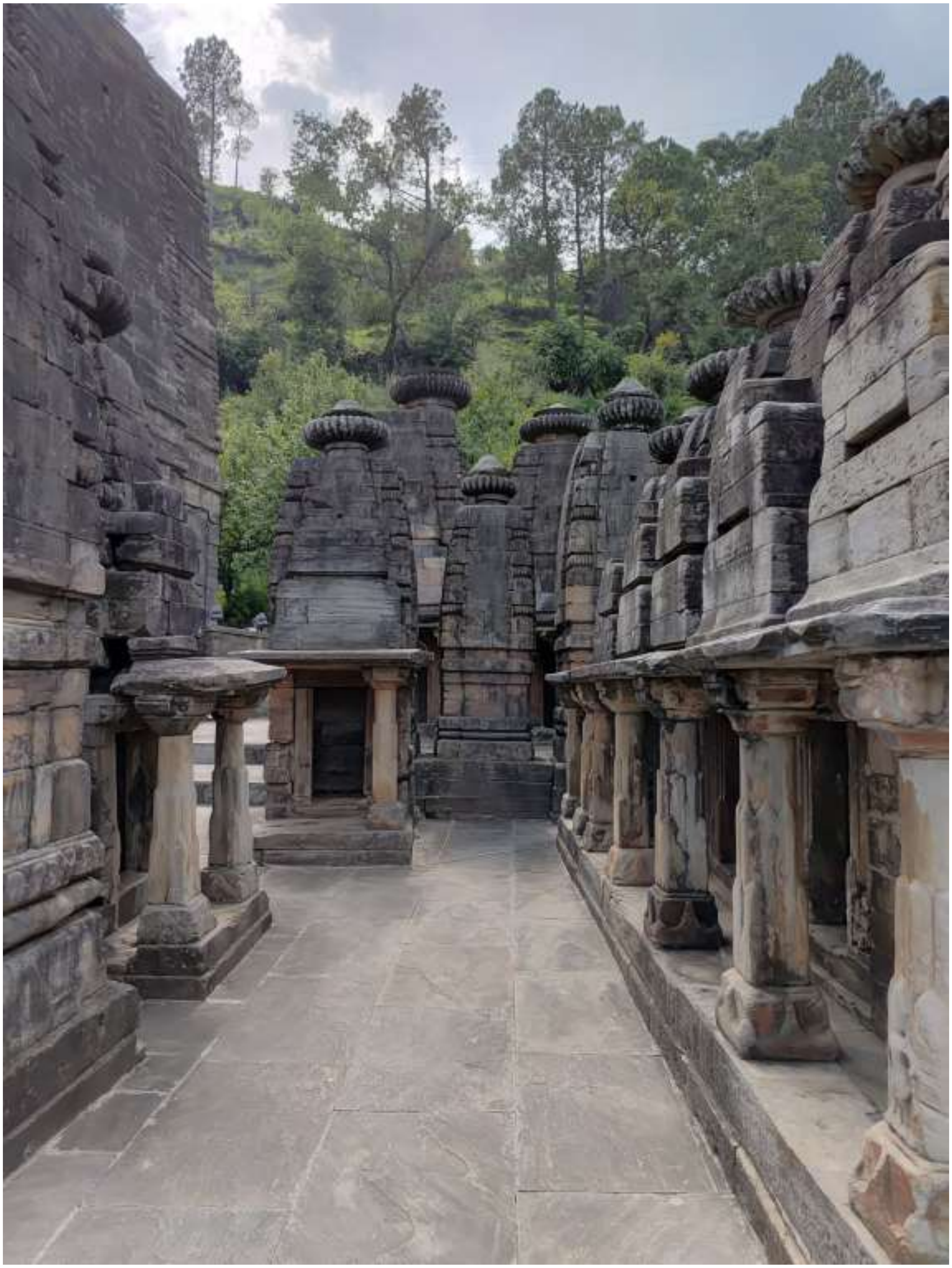
KRC চত্বর



সূর্যমন্দির , কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



সূর্যমন্দির প্রাঙ্গন, কাটারমল



Selected Comments

Gunjan G Traveler · 1w

আপনার সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ লেখার মধ্যে এমন এক আকর্ষণ রয়েছে, যা পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে কিংবদন্তি ও ইতিহাসের সুনিপুণ মেলবন্ধন লেখাকে দিয়েছে এক অনন্য স্বাদ। প্রতিটি লেখায় যেমন নতুন নতুন অজানা তথ্য জানার সুযোগ থাকে, তেমনি আপনার তোলা অপূর্ব ছবিগুলি ঘটনাপ্রবাহকে যেন জীবন্ত করে তোলে।

কাটারমল মন্দির সম্পর্কে আগে জানা ছিল না; আপনার লেখা ও ছবির মাধ্যমে তার অনন্য স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম। ঝুলা দেবীর মন্দিরে গিয়েছি, কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিংবদন্তি জানা ছিল না। আপনার স্বতন্ত্র লেখনিশৈলীতে কুমায়ুনের এই পর্বগুলি সত্যিই ভ্রমণসাহিত্যের এক অমূল্য উপহার।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 1w

সূর্যমন্দিরটির স্থাপত্য অপূর্ব। রাণীক্ষেতও ছুঁয়েছিলাম শুধু। আপেল বাগানটির কথা ও ফুলের বাগানের কথা মনে আছে
আপনার ভ্রমণের বর্ণনা জীবন্ত হয়ে উঠছে চোখের সামনে। তার সঙ্গে যে ইতিহাস ও কাহিনি মিলেমিশে আছে, এককথায় চমৎকার।

Reply Share

সুচিপত্র

কুমায়ুনের ডাকে – পর্ব ৪

বিনসর



Jayati Sen

জয়তী সেন

কুমায়ুনের ডাকে – পর্ব ৪

বিনসর

বিনসর দেখার ইচ্ছে বহুদিনের। এত সুন্দর সুন্দর বেড়ানোর গল্প , সঙ্গে প্রাণ জুড়ানো মন ভরানো ছবি দেখেছি যে বিনসর যেতে হবেই এটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু নিরুৎসাহিত করার মানুষের তো অভাব নেই, তারা তো বলেই দিল, বিনসরে তো কিসস্যু নেই শুধু জঙ্গল! সেই জঙ্গলেই যে ঘুরতে মন চায় সে আর বোঝাই কি করে। পারলে জঙ্গলের ভেতরেই মগডালে বাড়ি বানিয়ে থাকি! ভাগ্যক্রমে কন্যা আর কর্তা দুজনেই আমার মতই ছুটি কাটাতে শান্ত, নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশই বেশি পছন্দ করে । তাই অবশেষে মহানন্দে বিনসরের দিকে চললাম, আলমোড়াকে বিদায় জানিয়ে।

যাওয়ার পথে পড়ে চিতাই গোলু দেবতার মন্দির। গোলু দেবতাকে নিয়ে অনেক রূপকথা,গল্প,কাহিনী প্রচলিত আছে। কোথাও বলা হয় তিনি কাত্যুরি বংশের রাজপুত্র, কোথাও বা সেনাপতি আবার কোনও প্রচলিত বিশ্বাসে তিনি শিবের বা গৌড় ভৈরবেরই অবতার। তাঁর পরিচয় নিয়ে যত গল্প কথাই থাক না কেন, তিনি পাহাড়ের মানুষের কাছে প্রাণপ্রিয় ন্যায়ের দেবতা। অনেক গ্রামে তিনি কুলদেবতা হিসেবে পূজিত হন। কুমায়ুনের অনেক জায়গায় গোলু দেবতার মন্দির আছে। গোলু দেবতার কাছে ন্যায় বিচারের আর্জি পেশ করা হয় যেমন করে আদালতে বিচার চাওয়া হয়। তাই ভক্তরা আসেন, স্ট্যাম্প পেপারে বা সাদা কাগজে নিজেদের সমস্ত সমস্যার সমাধান চেয়ে, মনস্কামনা জানিয়ে আর্জি জানান আর ঘন্টা বাঁধেন মন্দির চত্বরে । মনস্কামনার পূরণ হলে ফের ভক্তরা এসে কৃতজ্ঞতা জানান। গোলুদেবতার মন্দিরে তাই দেখলাম কাগজে লেখা হাজার হাজার সব আর্জি আর সঙ্গে ঘন্টা ঝোলানো। দেখার মত দৃশ্য । মন্দিরের বারান্দা, করিডোরে বাঁদরের খুব উৎপাত। সুযোগ পেলেই ছোঁ মেরে প্রসাদী ঠোঙ্গায় হামলা চালাচ্ছে। খুবই সতর্ক থাকতে হয়। গোলু দেবতার কাছে পুজো দিয়ে, কিছুক্ষণ মন্দিরে কাটিয়ে এবার চললাম বিনসরের দিকে।

বিনসর আদতে ৪৫ বর্গ কিমি এলাকার একটা অভয়ারণ্য। আলমোড়া থেকে যার দূরত্ব ৩২ কিমি। ফরেস্ট গেটে গিয়ে পারমিট এবং টিকিট কাটতে হয় তবেই ভেতরে যাবার অনুমতি মেলে। অনেকেই দিনে দিনে ঘুরে চলে আসে, কিন্তু আমরা কুমায়ুন টুরিস্ট গেস্ট হাউসে (KMVN)একরাত থাকব। পারমিট নিয়ে আমরা চললাম KMVN এর দিকে। ফরেস্ট গেট থেকে গেস্ট হাউসের দূরত্ব দশ কিলোমিটার, সময় লাগে ৪৫ মিনিট। জুলাই মাস বলে কথা, চিন্তা ছিল যদি বর্ষার জন্য সব প্ল্যান ভেস্তে যায় তাহলে কি করব, কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল, আমরা যখন গেলাম তখন রোদ ঝলমল আকাশ। এই দশ কিলোমিটারের রাস্তা বেশ খারাপ, একে সরু পাকদন্ডী তার ওপর কোথাও কোথাও রাস্তা খানা খন্দে ভরা, গাড়ি চলল বেশ কসরত করে। ড্রাইভার ভাইয়ের স্টিয়ারিং এর ওপর প্রশ্নাতীত দখল। যাওয়ার পথে পড়ল পাইন আর ওক গাছের বন, মাঝে মাঝে রডোডেনড্রন আরো কত ধরণের গাছ, সব গাছের নাম কি আর জানি!

পাহাড়ের গা ঘেঁষে, ঘন জঙ্গল ভেদ করে গাড়ি চলেছে। মাঝপথে একটা সুন্দর সবুজ উপত্যকা পড়ল। আর তার মাঝে একটা ছোট মন্দির। বিনেশ্বর মহাদেবের মন্দির। নিরালা স্থানে এই মন্দিরের সমাহিত রূপ এবং অবস্থান মনে এক অপূর্ব প্রশান্তি আনে। মুগ্ধ আমি রাস্তা সংলগ্ন সিঁড়ি বেয়ে নীচে মন্দিরের দিকে যাই। ছোট এই প্রাচীন শিবমন্দিরে দর্শণার্থী শুধু আমরা তিনজন। মন্দিরের ঘন্টায় আঙুল ছোঁয়াই, সুমধুর অনুরণন নিস্তব্ধ উপত্যকায় ঢেউ তুলে মিলিয়ে যায়। এক ঐশ্বরিক পরিবেশ। উপাচার বা আয়োজন কিছু নাই, বিনেশ্বর মহাদেব দর্শনেই ভক্তের আনন্দ এ যেন ‘তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছ নীচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে’! রবি ঠাকুর ছাড়া এই অনুভুতি লিখিই বা কি ভাবে!

গাড়ি এগিয়ে চলে। বিনসরের অরণ্যের রূপ শুধু মুগ্ধতা নিয়ে দেখি। যতদূর সম্ভব কম ঝাঁকুনি দিয়ে ড্রাইভার ভাই আমাদের নির্বিঘ্নে পৌছে দিল গেস্ট হাউসে। এই গেস্ট হাউসের অবস্থান এক অনবদ্য স্থানে, বিনসরের জিরো পয়েন্টের থেকে দু' কিমি দূরে। চারপাশে শুধু ঘন জঙ্গল। গেস্ট হাউসের বিরাট চত্ত্বরের পূর্বদিকের বিল্ডিং এর ছাদে রয়েছে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী দেখার অসাধারণ কর্নার। আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্যোদয়ের সময় নন্দা দেবী থেকে শুরু করে পঞ্চচুল্লী পর্যন্ত এক বিরাট এলাকা জুড়ে পর্বতশৃঙ্খলার অনন্য সৌন্দর্য দেখা যায়। এই দৃশ্য দেখতে এখানে পর্যটকদের ভীড় লেগেই থাকে। যেহেতু ফরেস্টের মধ্যে অবস্থিত তাই কিছু কিছু ব্যাপারে যেমন বিদ্যুৎ বা গরম জল ব্যবহারে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। সৌর বিদ্যুত ছাড়াও বিদ্যুতের একটা নতুন সাব স্টেশন বসানোয়, বিদ্যুতের চাহিদা

মেটাতে কিছুটা সাহায্য হয়েছে তবুও দেখলাম আমরা ঢুকতেই কেয়ারটেকার জানালেন শুধুমাত্র সন্ধ্যে ৬.৩০ থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকবে। শুনে আশ্বস্ত হলাম যে রাতে কারেন্ট থাকবে, কারণ এতদিন জানতাম রাতে ইমারজেন্সি লাইট বা মোমবাতি ভরসা।যদিও রুমে দেখলাম মোমবাতি, দেশলাই সবই ছিল।

পুরো গেস্ট হাউসে সেইদিন একমাত্র আমরাই পর্যটক ছিলাম। তাই নিরিবিলিতে, একান্তে অসাধারন কিছু সময় কাটাতে পেরেছি। দু'চোখ ভরে নানা রকম পাখিদের আনাগোনা দেখলাম । বিনসরের অরণ্যে নানা ধরণের পাখি দেখা যায়। কিছু ক্যামেরাবন্দী করেছি । গেস্ট হাউস থেকে সাতশ মিটার দূরে রয়েছে বিনসর ডাক বাংলো। দুপাশে ঘন অরণ্য, মাঝে রাস্তা দিয়ে কিছুটা চড়াই উতরাই পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ডাক বাংলো দেখতে। যেতে যেতে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলাম বিশাল বিশাল বৃক্ষ,বেশির ভাগের কাণ্ডে শ্যাওলার পুরু আস্তরন, ক্ষণে ক্ষণে নাম না জানা পাখির ডাক অরণ্যের এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ভেদ করে চলে যাচ্ছে, কোথায় গাছের ঘনত্ব এত বেশি যে বেশ গা ছমছমে একটা আবহ। মেঘের আনাগোনার দরুণ সূর্যের তেজও কম। যেতে যেতে ভাবছিলাম এরকম জায়গার সন্ধান আরো আগে কেন পাইনি । আমাদের জুতোর হাল্কা খস খস শব্দ, পাখির ডাক আর কিছু ঝিঁঝিঁর আওয়াজ ছাড়া কোন শব্দ নেই। বাতাসে জঙ্গলের নিজস্ব একটা গন্ধ। এত বিশুদ্ধ নির্মল বাতাস, ফুসফুস ও যেন চমকে যাচ্ছে, প্রাণভরে মনের আর প্রাণের সিলিন্ডার পূর্ণ করি। শুধুই একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে এই অতুল ঐশ্বর্য্যকে দুচোখ ভরে শুধু দেখি ।

দশ পনের মিনিটেই এসে পৌঁছাই ডাকবাংলোর সামনে। বেশ বড় পরিসর। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭এ দু-তিনদিন ছিলেন । যদিও বর্তমান যে ব্রিটিশ বাংলোটা আমরা দেখলাম সেটা ১৯০২ এ নির্মিত। এখান থেকে সূর্যাস্ত নাকি খুব সুন্দর দেখা যায়। অনেকক্ষণ এই সুন্দর ডাকবাংলো সংলগ্ন চত্বরে বসে এর আশপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। মেঘ থাকায় আর সূর্যাস্তের অপেক্ষা করলাম না।

গেস্ট হাউস থেকে দু' কিমি দূরে জিরো পয়েন্ট, জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে সেখানে ট্রেক করে গেলে পুরো বিনসর উপত্যকা এবং হিমালায়ের পর্বত শৃঙ্গ দেখা যায় । সন্ধ্যে থেকেই মেঘের আনাগোনা চলছিল, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে ট্রেকের প্ল্যান বাদ দিতে হলো। সকালে খুব স্পষ্ট না হলেও এক ঝলক নন্দাদেবী শৃঙ্গ দর্শন করলাম। একটু পরেই মেঘগুলো সব নীচের দিকে নামতে শুরু করল। ছাদ থেকে দেখি সে এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য ! ঘন কুয়াশার মতো মুহূর্তে ছেয়ে গেল চারপাশ, আর নামল ঝিরঝিরে বৃষ্টি ।

কখনও জোরে কখনও ধীরে। জানালার বাইরে তাকাই, ওক গাছ, রডোডেন্ড্রন গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘন ছাই রঙা কুয়াশা, টুপটাপ গড়িয়ে পড়ছে জল, জানালার কাঁচ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে উঠছে, পাহাড়ে এমন মায়াবী বৃষ্টি মুখর সকাল দেখে যেন আশ মেটেনা।

বেলা গড়াতে আমাদেরও বিনসরের থেকে বিদায় নেওয়ার পালা এল।কিন্তু ঘন কুয়াশায় পাহাড়ি রাস্তা এতটাই ঢেকে ছিল যে গাড়ি চালানো বেশ বিপজ্জনক হয়ে গেল। সেই আলো আঁধারি কুয়াশায় আর ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে রীতিমত টান টান উত্তেজনায় বিনসর ফরেস্ট গেট পর্যন্ত দশ কিমি সর্পিল রাস্তা গাড়িতে পাড়ি দিয়ে এলাম। পেছনে ফেলে এলাম চোখের আরাম, প্রাণের আরাম দেওয়া একটা সুন্দর সবুজ মায়াবী পৃথিবী যাকে বাইরের কোলাহল, অশান্তি, অস্থিরতা কিছুই ছুঁতে পারেনা। এবার চললাম শেষ গন্তব্য মুক্তেশ্বরে। সেই গল্প নিয়ে আসছি অন্তিম পর্বে।

চিতাই গোলু দেবতা মন্দির , আলমোড়া



চিতাই গোলু দেবতা মন্দির , আলমোড়া



চিতাই গোলু দেবতা মন্দির , আলমোড়া



বিনসর অভয়ারণ্য প্রবেশ দ্বার




BINSAR WILDLIFE SANCTUARY
JAGESHWAR 60 Km
RANIKHET 62 Km
KAUSANI
DELHI - 396 Km
CORBETT N.P - 162 Km
ALMORA - 32 Km
KATHGODAM 110 Km
PANTNAGAR - 152 Km
NANITAL - 95 Km
@go_clean_go_gre



বিনেশ্বর মহাদেব মন্দির



KMVN বিনসর



KMVN বিনসরের চাতাল থেকে পশ্চিম দিকের বিল্ডিং



চাতাল থেকে পাহাড়ের দৃশ্য







বিনসর ডাক বাংলো যাওয়ার পথে দুপাশে ঘন জঙ্গল



বিনসর ডাক বাংলো যাওয়ার পথে দুপাশে ঘন জঙ্গল



বিনসর ডাক বাংলো যাওয়ার পথে দুপাশে ঘন জঙ্গল





Turkey tail fungus



ডাক বাংলোর প্রবেশে



बिनसर डाक बँगला
BINSAR DAK BUNGALOW
Swami Vivekananda during his second visit to Almora in 1897 stayed for two or three days at Binsar Dak Bungalow. In a letter dated 9th July 1897 addressed to brother disciple Swami Shivananda, Swamiji wrote, "We stayed at the Binsar Dak Bungalow for two or three days, and then I left for Shyamdhura."

ডাক বাংলো দূর থেকে



ডাক বাংলো দূর থেকে



ডাক বাংলো, বিনসর



ডাক বাংলো বিনসর





সান সেট পয়েন্ট, ডাক বাংলো, বিনসর







মেঘে ঢেকে যাচ্ছে





Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 6d
আপনার লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিনসর ঘুরে এলাম। এত জীবন্ত আর সুন্দর বর্ণনা! মাঝে মাঝেই ছোট ছোট গল্প বা মিথ আকর্ষণীয় করে তোলে লেখাটিকে। ছবিগুলো নয়নলোভন।

Reply Share

Jayati Sen · 6d
Ghosh Ruchismita ধন্যবাদ, ভালো লাগছে জেনে আমিও লেখার উৎসাহ পাচ্ছি।😊

Reply Share

Gunjan G Traveler · 6d
এক বিস্ময়ময় আকর্ষণে আপনার **বিনসর**-এর লেখাটি প্রায় একটানা পড়ে শেষ করলাম। বাংলা সাহিত্যে আপনার এমন স্বচ্ছন্দ বিচরণ সত্যিই প্রশংসনীয়। আপনার বর্ণনায় বিনসর যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। গলুদেবতার মন্দিরের কিংবদন্তি এবং সেখানে প্রচলিত অনন্য প্রথার কথা জেনে সমৃদ্ধ হলাম। বিনসরের বনবাংলো ও গেস্টহাউসের বিবরণও ছিল অত্যন্ত সুন্দর।

জঙ্গলের নিস্তব্ধতা আর তার অন্তর্নিহিত রোমাঞ্চ আপনি যে দক্ষতায় তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই শিহরণ জাগায়।

আমিও একবার কৌশানি যাওয়ার পথে বিনসর গিয়েছিলাম। তবে সেখানে থাকার সুযোগ হয়নি। কিছুক্ষণ জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে যে গভীর নীরবতার অনুভূতি পেয়েছিলাম, তা আজও মনে আছে। সেদিন বার্কিং ডিয়ারের ডাকও শুনেছিলাম—অবাক হয়ে দেখেছিলাম, তাদের ডাক অনেকটাই কুকুরের ঘেউ-ঘেউয়ের মতো শোনায়।

Reply Share

Jayati Sen · 6d
Gunjan G Traveler আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর রিভিউয়ের জন্য। ···

Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 5d
চৌখরি -বিনসরের নাম পেয়েছি ১৯৯১ র পরে। তাই ২০০১ এ যখন আবার গেলাম আলমোড়ায় ধর্মঘটের জন্য সব বানচাল হয়ে গেল। তবে আপনার লেখা পড়ে চোখের সামনে বিনসর কে যেন দেখতে পেলাম । অনেক ধন্যবাদ ।১৯৯১ সালে কৌশানি-গোয়ালদাম হয়ে রূপকুন্ড গিয়েছিলাম তখন মনেহয় বিনসরের নাম শুনিনি ।

Reply Share

Jayati Sen · 5d
Chandra Sekhar Dey পড়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যি আমরা কলেজ জীবনেও এসব জায়গার নাম শুনিনি,এখন ইন্টারনেটের যুগ আর travel blogger দের জন্য অনেক off beat location সম্পর্কে জানতে পারছি। এভাবেই naukuchiatal আর sattal সম্পর্কে জানতে পেরে ঘুরে এলাম।এবং খুবই ভালো লেগেছে।

Reply Share

সূচিপত্র

কুমায়ুনের ডাকে – পর্ব ৫ (অন্তিম পর্ব)

মুক্তেশ্বর



Jayati Sen

জয়তী সেন

কুমায়ুনের ডাকে – পর্ব ৫ (অন্তিম পর্ব)

মুক্তেশ্বর

এক পাহাড় থেকে নেমে এবার আবার চড়লাম অন্য পাহাড়ে। এলাম মুক্তেশ্বর। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বিনসরের উচ্চতা ৭৯৪০ ফিট আর মুক্তেশ্বরের ৭৫০০ ফিট। মুক্তেশ্বরে conifer বা পাইন জাতীয় এবং ওক গাছের অরণ্য থাকলেও এটা এখন আধা শহুরে হিল স্টেশন, অনেকটাই লোকালয় ঘেঁষা। অন্যদিকে বিনসরের অবস্থানটা পুরোটাই অভয়ারণ্যে । মুক্তেশ্বরের প্রবেশ মুখে একবার থামতে হল ফরেস্ট এন্ট্রির জন্য। যেতে যেতে দেখলাম রাস্তাটা বিনসরের মত অতোটাও খারাপ নয়, তুলনামুলক ভাবে একটু প্রশস্ত। পাহাড়ি রাস্তার দুপাশে কখনও পাহাড় দেখছি ,কখনও বা জঙ্গল , গাড়ি টার্ন নিলে উপত্যকা নয়তো খাদ দেখছি। বিনসর থেকে গাড়ি করে মুক্তেশ্বর পৌঁছাতে সময় লাগল তিন ঘন্টা।

মুক্তেশ্বর বলতেই যে নামটা মনে আসে তিনি হলেন জিম করবেট। মনে পড়ে ছোটবেলায় পড়া সেই বিখ্যাত বই The Temple Tiger and more man eaters of Kumaon এর হাড়হিম করা শিকারের গল্প- The Muktesar Man-eater। ১৯১০ এর ঘটনা, মুক্তেশ্বরে তখন এক নরখাদক বাঘ পরপর অনেক মানুষকে মেরে ফেলছে আর তাকে নিকেশ করতে ইংরেজ সরকার জিম করবেটকে দায়িত্ব দিলেন। করবেট সাহেব সেসময় থাকতেন নৈনিতালে। নৈনিতাল থেকে রওয়ানা হয়ে মুক্তেশ্বর এসে পৌঁছালেন ডাবল ব্যারেল .৫০০ এক্সপ্রেস রাইফেল নিয়ে আর লটবহর বইবার জন্য ছিল দু’জন লোক । মুক্তেশ্বর পোস্ট অফিস এবং বাজারের সামনে এসে ডাকবাংলো খুঁজতে লাগলেন। এক দোকানী তাঁকে ডাকবাংলোর হদিশ দিলে তিনি আধ মাইল হেঁটে গিয়ে সেই ডাকবাংলোয় উঠলেন। সেই ঘটনার উল্লেখ গল্পেই আছে। শতাব্দী পেরিয়ে সেই ডাকবাংলোটাই এখন কুমায়ুন বিকাশ মন্ডলের(KMVN) এর গেস্ট হাউসের একটা অংশ হয়েছে যাকে বলে হেরিটেজ করবেট বাংলো । Youtube এ অনেক

ব্লগারের সৌজন্যে এই বাংলোর ভিডিও দেখেছি এবং এর অবস্থানের এত প্রশংসা শুনেছি যে মুক্তেশ্বরে গেলে এখানেই থাকব বলে ভেবেছি এবং অফ সিজন হওয়াতে চট করে পেয়েও গেলাম।

জিম করবেটের কথা মনে করতে করতে কখন যে গাড়ি সেই পোস্ট অফিসের কাছে চলে এসেছে খেয়াল করিনি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি পোস্ট অফিস! তার মানে গন্তব্যে প্রায় এসেই গেছি। সামনেই মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির।দর্শনার্থীর ভিড়। সেজন্য সরু রাস্তায় গাড়ির জ্যাম লেগে রয়েছে। শম্বুক গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলল মুক্তেশ্বর জিরো পয়েন্টে করবেট বাংলোর দিকে, এখানেই দু'রাতের জন্য এবারে আমাদের আস্তানা।

একটা অপূর্ব সুন্দর টুরিস্ট স্পট এই জিরো পয়েন্ট। গাড়ি চলাচল করার মত রাস্তা এখানেই শেষ। আর সেখানেই দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে একটা হেরিটেজ বাংলো, সামনে বিরাট এক খোলা চত্ত্বর। সারাদিন বসে শুধু পাহাড় মেঘ আর রোদের খেলা দেখে যাও। পাহাড়ি উপত্যকায় দূরে দেখা যায় জনবসতি, রয়েছে পাইন, দেওদার, ওকের জঙ্গল আর পাখির কলকাকলি। ভারতের অনেক প্রান্তে ঘুরেছি, থেকেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার দেখা এটাই সেরা স্পট যেখানে বারান্দায় বসে ইচ্ছেমত বা সামনের বিশাল চত্ত্বরে বসে একদম কাছ থেকে বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনন্ত মুগ্ধতায় কুমায়ুন হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী দেখলাম।

হঠাৎই অবিশ্বাস্যভাবেই মেঘের আনাগোনার মধ্যেই আধঘন্টার মত পশ্চিম থেকে উত্তরপ্রান্তে এক বিরাট এলাকা জুড়ে দৃশ্যমান হল একে একে তুষাশুভ্র নীলকণ্ঠ, নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, পঞ্চচুল্লি আরো অনেকে। বর্ষার ঘন্টা বেজে গেছে,মেঘ কখনও হুড়মুড় করে আসছে কখনও উড়ে যাচ্ছে, সেই মেঘের খেলা দেখাতে দেখাতে ঈশ্বরের কি মতিগতি হল কে জানে হঠাৎ খুল যা সিম সিম করে মেঘের চাদর সরিয়ে নিলেন। সে যেন আমার কাছে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন! সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার। দিব্যি বসে আশপাশের দৃশ্য দেখছিলাম। আচমকা ম্যাজিক। শরৎচন্দ্রের গল্প শ্রীনাথ বহুরুপীকে মনে আছে নিশ্চয়! ছেলেপিলেরা ঢুলু ঢুলু চোখে হারিকেনের আলোয় পড়তে বসেছে এমন সময় বাঘের বেশে শ্রীনাথ বহুরূপীর উদয়! মূহুর্তে হইচই, চেঁচামেচি বেধে গেল, লাঠি লাও, বন্দুক লাও, লাও তো বটে কিন্তু আনে কে! আমারও সেই অবস্থা, দূরবীন কই, ক্যামেরা কই! ব্যাগ তোলপাড় করি। সেকি অপূর্ব দৃশ্য! দেখে দেখেও আশ মেটেনা। মনের ক্যামেরায় ছবি তুলেই চললাম। মেঘের কব্জায় থেকেও যদি এমন দৃশ্য দেখা সম্ভব তাহলে বর্ষার পরে মেঘমুক্ত আকাশে এখান থেকে হিমালয় দর্শন কত মনোমুগ্ধকর হতে পারে তা কল্পনা করে ভাবলাম তখন কি এখানে আবার আসার সুযোগ হবে?

পরদিন সকাল হল অবিরাম বর্ষণের মধ্যে দিয়ে। সারা রাত ধরেই অঝোরধারায় পড়ছিল। বাংলোর সামনে পাহাড়, উপত্যকা একদম ঘন কুয়াশায় অদৃশ্য যাকে বলে আবহাওয়াবিদের ভাষায় শূন্য দৃশ্যমানতা! বৃষ্টির বেগ কমতে ছাতা নিয়ে আমরা হেঁটে চললাম মুক্তেশ্বর ধামের উদ্দেশ্যে। খুবই কাছে, পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। এই ৩৫০ বছরের প্রাচীন মুক্তেশ্বর ধাম মন্দিরের অবস্থান পাহাড়ের চুড়ায় আর যেহেতু মুক্তেশ্বর অঞ্চলের উচ্চতাই ৭৫০০ ফিট, তাই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কিছুটা তো কষ্ট হবেই, হাঁপ ধরবে। কতোগুলো সিঁড়ি আছে গুনিনি তবে সে অনেক! সুন্দর বাঁধানো, চওড়া সিঁড়ি জরীপ করে একটু সাহস পেলাম, খুব একটা কষ্টকর হবেনা বলে মনকে বোঝাই! পুরো সিঁড়ি এলাকা শেড দেওয়া তাই বৃষ্টির থেকে বাঁচোয়া। আবহাওয়া একটু একটু করে ঠিক হলেও ঠান্ডা বাতাস চলছিল আর সঙ্গে হাল্কা বৃষ্টির ছাট। মূল মন্দিরে পৌঁছানোর কিছুটা আগে পর্যন্ত জুতো পরেই ওঠা যায়। তারপর জুতো রাখার স্ট্যান্ড রয়েছে, সেখান থেকে বড় জোর সাত-আটটা সিঁড়ি বেয়ে উঠলে দেবী দুর্গার ছোট মন্দির। এরপরে আরো কয়েক ধাপ ওপরে উঠলে মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির। দেবাদিদেব এখানে শ্বেতশুভ্র শিবলিঙ্গে বিরাজমান। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী স্বয়ং মহাদেব সাদা মহিষের রূপ ধরে অসুর বধ করেন এবং এই শ্বেতশুভ্র শিবলিঙ্গ তারই প্রতীক। পূজা দিয়ে মন্দিরের চত্বর থেকে পুরো মুক্তেশ্বর উপত্যকা আর পাহাড়ের অনবদ্য দৃশ্য দেখলাম।

এবার মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে প্রায় ২৫০ মিটার হেঁটে চললাম চউলি কি জালি দেখতে। এটা পাহাড়ের গায়ে একটা geological rock formation। দেখে মনে হয় বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে পাথুরে পাহাড়কে যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে কাটা হয়েছে । আর তার পাশেই গভীর খাদ। বেশ বিপজ্জনক স্থান। চারপাশের নীল সবুজ পাহাড়ে এবং উপত্যকায় সাদা, ধুসর, চলমান, ভাসমান সব ধরণের মেঘের আনাগোনা দেখবার মতো এবং সেই সঙ্গে পুরো মুক্তেশ্বরের ১৮০ ডিগ্রি view। ছবি তোলার জন্য বেশ উপযুক্ত জায়গা। আর তাই টুরিস্টদের ভীড়ও বেশ দেখলাম।

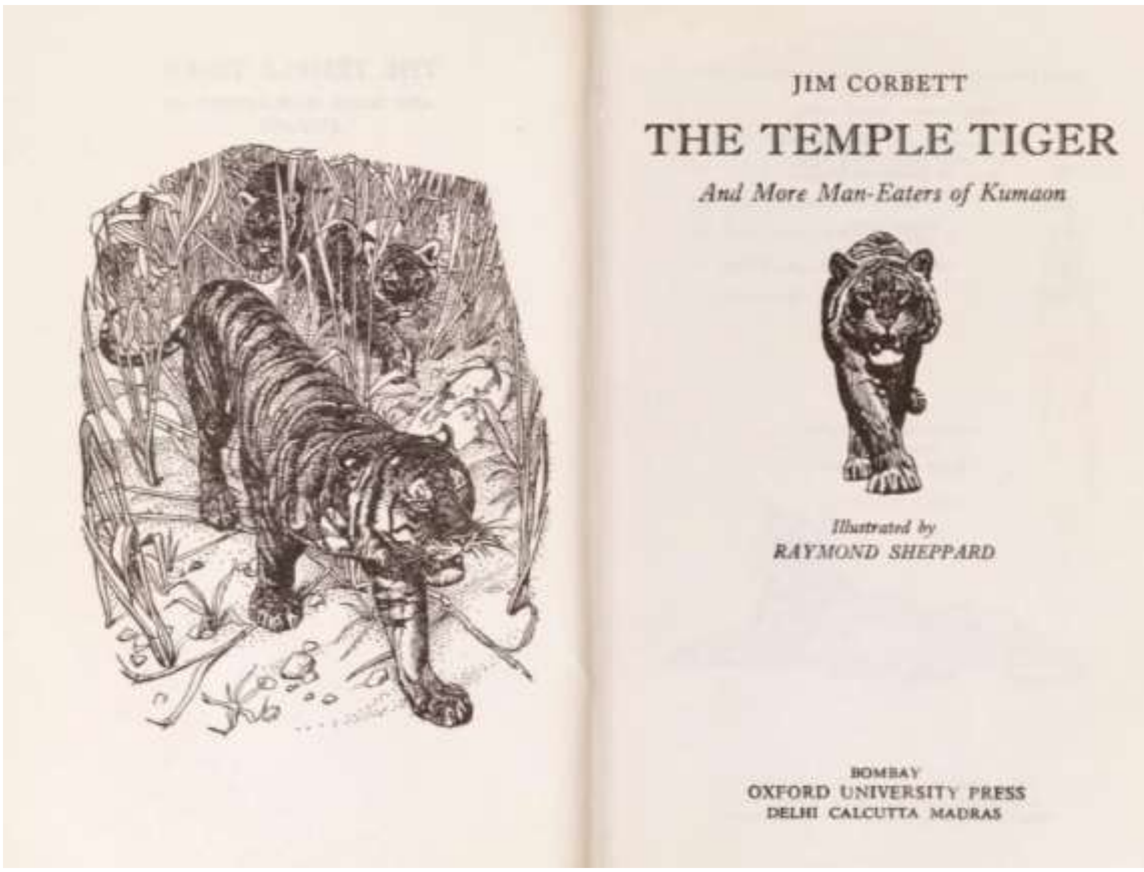
মুক্তেশ্বরের আশেপাশে আরো কিছু দর্শনীয় স্থান থাকলেও আমরা ঠিক করলাম নিরিবিলিতে করবেট বাংলোর চত্বরে বসেই বিকেলটা কাটাব। এরকম সুন্দর রেস্ট হাউস আর অনায়াস সৌন্দর্য উপভোগ সব জায়গায় হয় না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে গল্প আর আড্ডায় মুক্তেশ্বরের সেই মায়াবী বিকেল কখন যে হারিয়ে গেল বলতে পারিনা। পরদিন মুক্তেশ্বরকে বিদায় জানিয়ে এক গুচ্ছের সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা আর ছবির মত পাহাড়কে পেছনে রেখে চললাম সমতলে পন্থনগরের দিকে। যাওয়ার পথে একটা ছোট্ট পাহাড়ি দোকানে থামলাম, পাহাড় ঘোরার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করতে টুকটাক স্মারক কিনে নিলাম।

পন্থনগর পৌছাঁতে না পৌঁছাতেই পাহাড়ি ঠান্ডা আবহাওয়া স্রেফ উবে গেল। এতক্ষণ ধরে যে পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে এঁকেবেঁকে চলছিলাম সেও পেছনে পরে রইল। এসে পড়লাম পাহাড়ের পাদদেশে। পন্থনগরের সঙ্গে কর্তামশাইয়ের পুরোনো রিস্তা! পুরো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন কাটিয়েছেন এই পন্থনগরের বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ১২,৬১১ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা ভারতের সর্ববৃহৎ এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। দিল্লি থেকে পন্থনগরের ফ্লাইটে যখন পন্থনগর নামছিলাম তখন সেই ছোট্ট বিমানবন্দরের চারপাশের বিস্তীর্ণ ধান খেত দেখিয়ে কর্তামশাই বলছিলেন দেখো এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি যে ঠিক কতটা বড় সেটা মালুম হল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে। বিশাল ক্যাম্পাস। এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০এ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে শুধুই কৃষিজমি । বিস্মিত হলাম দেখে প্রায় অধিকাংশ একতলা কোয়ার্টার বা বাসস্থানের সামনের বাগান এলাকাতেও ধানের চাষ হচ্ছে।

গাড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে দেখতে দেখতে কখনও ডানে কখনো বামে দেখিয়ে কর্তা বলে চলেছেন এই হস্টেলে আমি থাকতাম, ঐযে গান্ধী হল ওখানে প্রতি সপ্তাহে একটা করে সিনেমা দেখতে যেতাম,এটা অমুক ডিপার্টমেন্ট, এখান দিয়ে মার্কেটে যেতাম, আরে এটা তো ছিলনা তখন! এরকম নানা গল্প। লক্ষ্য করলাম স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে অতীত আর বর্তমান কে মেলাতে গিয়ে কি নিদারুণ সংঘর্ষ চলছে। কত কিছু পালটে গেছে, কত নতুন বিল্ডিং হয়ে গেছে, স্মৃতিগুলোকে আবার নতুন ফরম্যাটে বসাতে হচ্ছে। কলেজের করিডোরে, ল্যাবে বা হস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে কলেজ জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোকে শুধু একবার ছুঁয়ে দেখার প্রয়াস। ডিপার্টমেন্টে আলাপ হল নবীন প্রবীন অধ্যাপকদের সঙ্গে, সমাদর করে বসালেন, চা খেতে খেতে চলল স্মৃতি রোমন্থন। অনুভব করলাম ভ্রমণ শুধুমাত্র স্থানের হয়না, অতীত ছুঁয়ে আসাটাও একটা ভ্রমণ। ভ্রমণ শুরু হয়েছিল স্মৃতিচারণের উপলক্ষ্যে , সমাপ্তও হল অন্য এক স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে।


तीय डाक
सेवा-जन सेवा
India Post
Dak Sewa-Jan Sewa
मुक्तेश्वर
उप डाकघर
MUKTESHWA
SUB POST OFFICE
PIN CODE - 26313


1905



JIM CORBETT

THE TEMPLE TIGER

And More Man-Eaters of Kumaon

Illustrated by
RAYMOND SHEPPARD

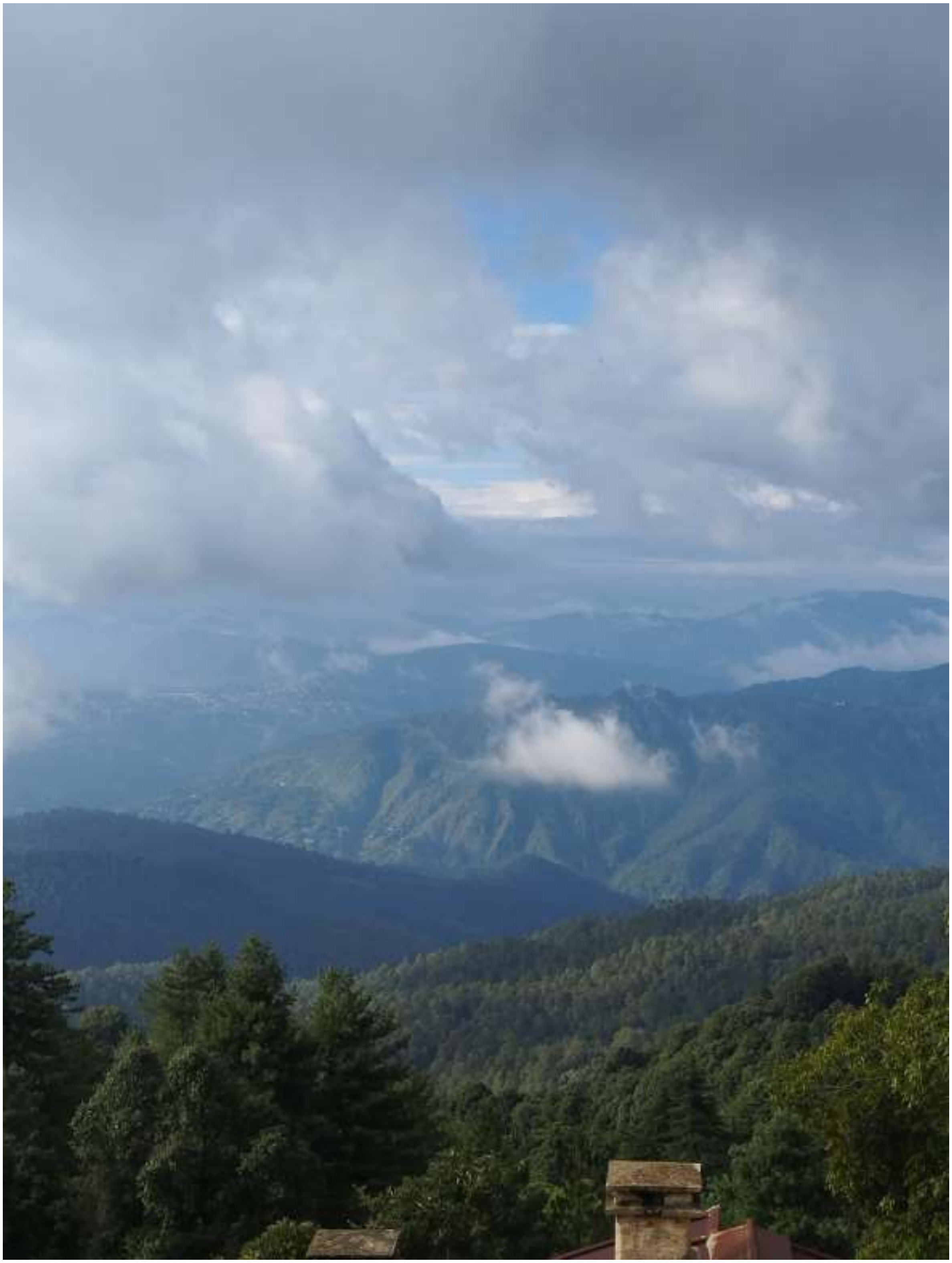
BOMBAY
OXFORD UNIVERSITY PRESS
DELHI CALCUTTA MADRAS

বিনসর অভয়ারণ্য প্রবেশ দ্বার









হেরিটেজ জিম করবেট বাংলো



জিরো পয়েন্ট মুক্তেশ্বর, জিম করবেট বাংলো





জিরো পয়েন্ট মুক্তেশ্বর থেকে



জিরো পয়েন্ট মুক্তেশ্বর থেকে



মুক্তেশ্বর মন্দিরের পথে

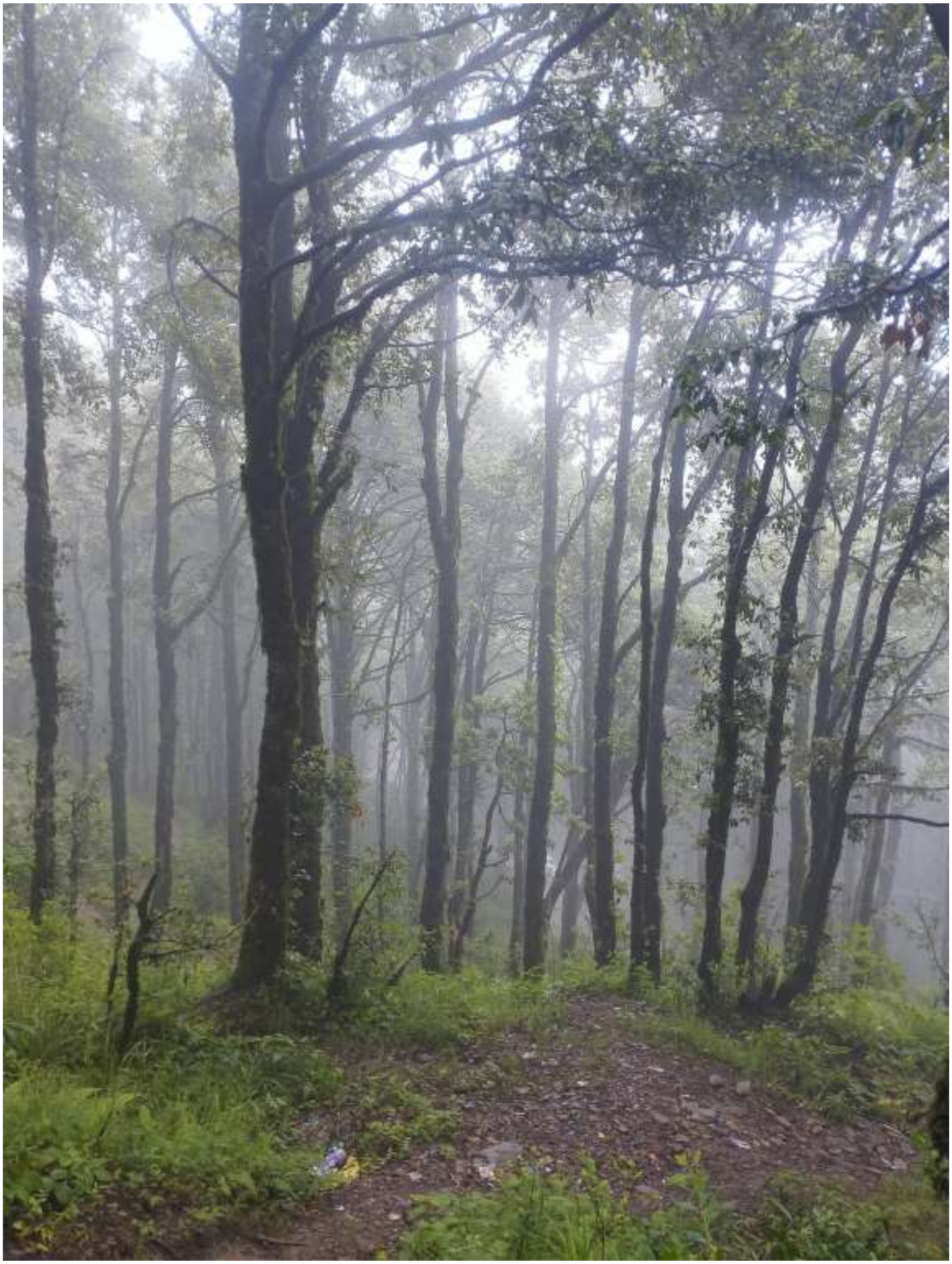


ওপরে মুক্তেশ্বর মন্দির





মুক্তেশ্বর মন্দির থেকে নামার পথে



চউলি কি জালি



চউলি কি জালি



চউলি কি জালি








201

GB Pant University of Agriculture and Technology




कृषि महाविद्यालय
COLLEGE OF AGRICULTURE

Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 5d
আপনার লেখায় এক অদ্ভুত জাদু আছে। পড়তে পড়তে যেন গল্প শুনতে শুনতে আমিও ঘুরে বেড়াচ্ছি। যাই হোক ঘুরে এলাম কুমায়ুন, বিনসর, মুক্তেশ্বর। ছবিগুলো সেই দেখাকে আরও সার্থক করল।

Reply Share

Jayati Sen · 5d
Ghosh Ruchismita অসংখ্য ধন্যবাদ। এত সুন্দর করে বললেন😊,তারপরে আর কি বলি। আপনাদের ভালো লেগেছে এটাই আমার সেরা প্রাপ্তি।

Reply Share

Gunjan G Traveler · 5d
কুমায়ুনের ডাকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ছিল। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল এক অনবদ্য ও মনোগ্রাহী রচনার মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্যে আপনার অবাধ বিচরণ এবং শব্দের ওপর অসাধারণ দখলের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। এই লেখাতেও প্রকৃতিকে ঘিরে আপনার মায়াবী চিত্রভাষ্য পাঠককে মুহূর্তেই পৌঁছে দেয় মুক্তেশ্বরের অপার সৌন্দর্যের মাঝে। বৃষ্টি, রোদ, মেঘ আর তাদের ফাঁক গলে উঁকি দেওয়া হিমালয়ের বিখ্যাত শৃঙ্গগুলির বর্ণনা যেন চোখের সামনে এক জীবন্ত ক্যানভাস এঁকে দেয়। সঙ্গে দুর্দান্ত ছবিগুলিও লেখাটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। শব্দের সঙ্গে ছবির এই অপূর্ব মেলবন্ধনে মনে হয়েছে, আমরাও যেন আপনার সঙ্গে সেই পাহাড়ি পথে হেঁটে চলেছি, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করছি।

আপনার লেখার মাধ্যমে জানতে পারলাম জিম করবেট-সম্পর্কিত KMVN-এর ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, মন্দিরকে ঘিরে প্রচলিত কিংবদন্তি এবং চিলা কি জালির পরিচয়—সব মিলিয়ে লেখাটি হয়ে উঠেছে তথ্য, ইতিহাস ও অনুভূতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। পন্তনগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেল, আর তার সঙ্গে যুক্ত আপনার স্মৃতিচারণও পড়ে খুব ভালো লাগল।

আমার অনুরোধের মর্যাদা দিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচটি পর্ব ধারাবাহিকভাবে পোস্ট করার জন্য আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, কুমায়ুনের ডাকের এই পাঁচটি পর্বই আমাদের জুলাই মাসের 'ভ্রাম্যমাণ' ই-পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

আপনি এলেন, লিখলেন, আর পাঠকের মন জয় করলেন—এ কথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। আপনার প্রতিটি লেখা আমাদের গ্রুপের মর্যাদা ও সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

আপনি এলেন, লিখলেন, আর পাঠকের মন জয় করলেন—এ কথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। আপনার প্রতিটি লেখা আমাদের গ্রুপের মর্যাদা ও সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

প্রত্যেক শুরুর যেমন একটি সমাপ্তি থাকে, তেমনি আজ কুমায়ুনের ডাকে ধারাবাহিকেরও শেষ পর্ব প্রকাশিত হল। স্বাভাবিকভাবেই মনটা একটু খারাপ লাগছে।

আপনার ব্লগে দেবভূমি নিয়ে আরও বেশ কিছু অসাধারণ পর্ব রয়েছে। আন্তরিক অনুরোধ রইল, ভবিষ্যতে সেগুলিও আমাদের গ্রুপে ধারাবাহিকভাবে পোস্ট করবেন। শুধু তাই নয়, আপনার ভ্রমণবিষয়ক অন্যান্য মূল্যবান লেখাগুলিও একে একে আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হব।

ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনার কলমের জাদু এবং অসাধারণ ছবির মাধ্যমে ভবিষ্যতেও এমন মনোমুগ্ধকর ভ্রমণসাহিত্য পড়ার অপেক্ষায় রইলাম।
অশেষ ধন্যবাদ

Reply Share Edited

Jayati Sen · 5d
Gunjan G Traveler অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি প্রতিটি লেখা পড়েছেন এবং বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন এর থেকে বড় পাওয়া কি হতে পারে । সামান্য লেখার অসামান্য রিভিউ পেলাম। আমি আপ্লুত ।এই গ্রুপ থেকে এত ভালো response পাব ভাবিনি। e- magazine এ পুরো লেখাটি প্রকাশিত হবে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম । আমি অবশ্যই মাঝে মধ্যে আগের লেখাগুলো দেব। গ্রুপটা আরও জনপ্রিয় হোক এই আশা করছি,সবাই তাদের ভ্রমণ কাহিনী share করুক আর আমরাও নিত্য নতুন জায়গার গল্প শুনি। অনেক শুভেচ্ছা রইল।

Reply Share

Selected Comments

Susmita Kumkum Bagchi · 5d
খুব ভাল লাগল। আপনার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তেশ্বর ঘুরে নিলাম। ছবিগুলো দারুণ👌 👌

Reply Share

Jayati Sen · 5d
Susmita Kumkum Bagchi অসংখ্য ধন্যবাদ।😊

Reply Share

Shibanshu De · 4d
ধারাবাহিক ভ্রমণ পর্বের সব কিস্তিগুলিই পড়লুম। সহৃদয় পর্যটকের আন্তরিক দিনলিপি। চমৎকার লাগলো।

কুমায়ুঁ আমার বাকেট লিস্টে অনেকদিন ধরেই আছে। গত বছর যাওয়া পাকা ছিলো। কিন্তু পাহাড়ি ধস, বন্যার জন্য যাওয়া বাতিল হলো। যেতে হবে। মুক্তসর লিস্টে ছিলো না। কিন্তু করবেট বাংলোর টানে একবার যেতে হবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

Reply Share

Jayati Sen · 4d
Shibanshu De অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, করবেট বাংলোয় থাকার চেষ্টা করবেন, ২০২ নম্বর রুমে,😊, ওখানেই নাকি করবেট ছিলেন কেয়ারটেকার বলল,সত্যি মিথ্যে জানিনা তবে রুমটি বেশ বড়। করবে ট সায়েবের দেখা পাব ভেবেছিলাম, সেইটা আর হলো না।😃

Reply Share

সুচিপত্র



ভ্রমণপিপাসুরা নানা উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন - কেউ আনন্দের খোঁজে, কেউ অবসর যাপনের জন্য, কেউ বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সঙ্গে স্মরণীয় মুহূর্ত কাটাতে, আবার কেউ নতুন স্থান, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করার নেশায়।

অনেক সময় ভ্রমণের পরিকল্পনা করলেও সেই অঞ্চলের দর্শনীয় স্থান, আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য, দর্শনের সময়সূচি, ভ্রমণের সঠিক সময়, যাতায়াতের সুবিধা বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না নিয়েই যাত্রা শুরু করি। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অদেখাই থেকে যায়। পরে যখন সেসব সম্পর্কে জানতে পারি, তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। জীবনের বাস্তবতায় সব সময় একই জায়গায় দ্বিতীয়বার ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয় না।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই আমাদের এই ভ্রমণস্থলী-তথ্যকোষ বিভাগটির উদ্যোগ। এই বিভাগে বিভিন্ন রাজ্যের শহর বা জেলাভিত্তিক দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় তথ্য একত্রিত করে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকের সূচনা হচ্ছে গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক রাজ্যকে নিয়ে। এই সংখ্যায় কর্নাটক রাজ্যের মহীশূর শহর ও তার কাছাকাছি ভ্রমণ দ্রষ্টব্য স্থানের কিছু তথ্য উপস্থিত করা হল।

আমাদের আন্তরিক আশা, ভ্রমণের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তব সফরের প্রতিটি ধাপে এই তথ্যসমূহ আপনার জন্য একটি কার্যকর সহায়ক নির্দেশিকা বা ট্রাভেল গাইড হিসেবে কাজ করবে এবং আপনার ভ্রমণকে আরও সমৃদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও স্মরণীয় করে তুলবে।

কর্ণাটকঃ মহীশূর রিজিওনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



Gunjan Guha



রিজিওনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি (মাইসুরু): প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের অনন্য পাঠশালা।

মাইসুরুর করঞ্জি হ্রদের শান্ত পরিবেশ এবং চামুন্ডি পাহাড়ের মনোরম পটভূমিতে অবস্থিত রিজিওনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি (Regional Museum of Natural History – RMNH) দক্ষিণ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর। ভারতের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সংগ্রহশালাটি ১৯৯৫ সালের ২০ মে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরাই এই জাদুঘরের মূল উদ্দেশ্য।

- জাদুঘরটির অন্যতম আকর্ষণ
- জীববৈচিত্র্য গ্যালারি (Biological Diversity Gallery)। এখানে দক্ষিণ ভারতের অরণ্য, নদী, পাহাড়, বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদজগৎ এবং ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যকে জীবন্ত ডায়োরামা, মডেল ও তথ্যচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষভাবে পশ্চিমঘাটের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে দর্শনার্থীরা বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারেন।
- জীবনের বিবর্তন গ্যালারি (Life Through the Ages Gallery)। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে জীবনের ক্রমবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস এখানে ধাপে ধাপে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন জীবাশ্মের প্রতিরূপ, ত্রিমাত্রিক মডেল এবং টানেল-ভিত্তিক প্রদর্শনী দর্শকদের অতীতের পৃথিবীর এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রায় নিয়ে যায়।
- শিশু ও কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ডিসকভারি সেন্টার (Discovery Centre)। এখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক নমুনা সরাসরি পর্যবেক্ষণ, স্পর্শ এবং শিক্ষামূলক ইন্টারঅ্যাকটিভ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে শেখার বিষয়টি হয়ে ওঠে আনন্দময় ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক।

জাদুঘরটি কেবল প্রদর্শনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সারা বছর ধরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকৃতি বিষয়ক নানা কর্মশালা, বক্তৃতা, বিশেষ প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থী, গবেষক এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের বিস্ময়কর জগতকে কাছ থেকে জানার জন্য রিজিওনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি এক অনন্য গন্তব্য। আধুনিক উপস্থাপনা, তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনী এবং শিক্ষামূলক পরিবেশের কারণে এটি শিশু, শিক্ষার্থী, গবেষক ও প্রকৃতিপ্রেমী—সকলের কাছেই সমান আকর্ষণীয়।

- দর্শনার্থীদের জন্য তথ্য

অবস্থান: টি. নারসিপুরা রোড, সিদ্ধার্থনগর, মাইসুরু, কর্ণাটক।

খোলার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

সাপ্তাহিক বন্ধ: সোমবার।

প্রবেশমূল্য: সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

সুবিধা: হুইলচেয়ার-সহায়ক প্রবেশপথ, গ্রন্থাগার, ক্যাফেটেরিয়া এবং আলোকচিত্র ও ভিডিওগ্রহণের সুবিধা।

সংগৃহীত

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর
মাইসুরু চিড়িয়াখানা
সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



Gunjan Guha



মাইসুরু চিড়িয়াখানা: রাজকীয় নগরীর প্রাণের অরণ্য ।

মহীশূরের ঐতিহ্যবাহী নগরীতে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে রাজপ্রাসাদের জৌলুস, প্রশস্ত রাস্তা আর সুপরিকল্পিত শহর। কিন্তু এই শহরের আরেকটি অনন্য আকর্ষণ হলো মাইসুরু চিড়িয়াখানা, যার আনুষ্ঠানিক নাম 'শ্রী চামারাজেন্দ্র জুলজিক্যাল গার্ডেনস'। ১৮৯২ সালে মহারাজা চামারাজা ওয়াদিয়ারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই চিড়িয়াখানা আজ ভারতের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক সুনিয়ন্ত্রিত চিড়িয়াখানাগুলির মধ্যে অন্যতম।

শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রায় ১৫৭ একর বিস্তৃত এই সবুজ পরিসরে প্রবেশ করতেই মনে হয় যেন কংক্রিটের জগত ছেড়ে প্রকৃতির এক শান্ত আশ্রয়ে এসে পড়েছি। ছায়াঘেরা পথ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং প্রাণীদের জন্য প্রাকৃতিক আবাসের অনুকরণে তৈরি প্রশস্ত ঘের—সব মিলিয়ে দর্শনার্থীদের জন্য এটি এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

চিড়িয়াখানাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রাণীসংগ্রহ। এখানে দেখা মেলে সাদা বাঘ, সিংহ, হাতি, জিরাফ, জেব্রা, গণ্ডার, জলহস্তী, নানা প্রজাতির হরিণ, বিরল পাখি এবং বিভিন্ন সরীসৃপের। একসময় ভারতের একমাত্র গরিলা, ওরাংওটান ও শিম্পাঞ্জির সংগ্রহশালাগুলির অন্যতম ছিল এই চিড়িয়াখানা। প্রাণীদের সুস্থতা ও স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখতে এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ পুনর্নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাইসুরু চিড়িয়াখানা শুধু বিনোদনের কেন্দ্র নয়; এটি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ, গবেষণা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীদের সংরক্ষণ ও প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে এটি আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসিত। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী এখানে এসে শুধু প্রাণী দেখেন না, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে নতুন করে সচেতনও হন।

একটি পূর্ণ দিন না হলেও অন্তত তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় নিয়ে চিড়িয়াখানাটি ঘুরে দেখা উচিত। পথের ধারে বিশ্রামের ব্যবস্থা, পানীয় জলের সুবিধা এবং ব্যাটারি চালিত যান দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতাকে আরও আরামদায়ক করে তোলে।

মহীশূর ভ্রমণে রাজপ্রাসাদ, চামুণ্ডি পাহাড় বা বৃন্দাবন গার্ডেনের পাশাপাশি মাইসুরু চিড়িয়াখানাও অবশ্যই দেখার মতো একটি স্থান। প্রকৃতি, প্রাণীজগৎ ও সংরক্ষণের এই মিলিত পাঠশালা শিশু থেকে প্রৌঢ়—সকলের মনেই এক স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

- মহীশূর চিড়িয়াখানার সময়সূচি দিন খোলার সময় বন্ধের সময়
  সোমবার থেকে রবিবার সকাল ৮:৩০ বিকাল ৫:৩০
  মঙ্গলবার বন্ধ
- বন্ধ দ্রষ্টব্য: বিকেল ৪:৩০-এর পর আর প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না; তাই তাড়াহুড়ো না করে স্বাচ্ছন্দ্যে চিড়িয়াখানাটি ঘুরে দেখার জন্য আগেভাগে পৌঁছানোই ভালো।

সংগৃহীত।

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর
স্যান্ড স্কাল্পচার মিউজিয়াম
সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



Gunjan Guha



বালুকণার বিস্ময়লোক: মাইসুরুর স্যান্ড স্কাল্পচার মিউজিয়াম।

সমুদ্রতটের ক্ষণস্থায়ী বালুকাশিল্পকে স্থায়ী প্রদর্শনীর রূপ দেওয়ার এক অভিনব স্বপ্নের নাম মাইসুরুর স্যান্ড স্কাল্পচার মিউজিয়াম। এখানে বালির কণাগুলি যেন শিল্পীর স্পর্শে ইতিহাস, পুরাণ, সংস্কৃতি ও কল্পনার ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে। চামুণ্ডি পাহাড়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এই জাদুঘরে প্রবেশ করলেই মনে হয়, যেন বালুকণার শরীরে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠেছে। কখনও দেবদেবীর মহিমা, কখনও রাজকীয় দশরার শোভাযাত্রা, আবার কখনও রূপকথার জগত—সবই ফুটে উঠেছে নিখুঁত কারুকার্যে। মাইসুরুর ঐতিহ্য ও শিল্পসত্তার এক অনন্য মিলনক্ষেত্র এই জাদুঘর, যা দর্শনার্থীদের বিস্ময় ও মুগ্ধতার এক অন্য ভুবনে নিয়ে যায়।

১০০ ট্রাকেরও বেশি বালু দিয়ে তৈরি প্রায় ১৫০টি ভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয় এই জাদুঘরে। প্রদর্শনীগুলোকে ১৬টি ভিন্ন বিষয় বা থিমের আওতায় সাজানো হয়েছে, যেমন—ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বন্যপ্রাণী, পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদি। প্রায় ১৩,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বালু-ভাস্কর্যগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সেগুলো বছরের পর বছর টিকে থাকে; বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য এগুলোর ওপর অস্থায়ী ছাদের ব্যবস্থাও রয়েছে।

জাদুঘরের প্রধান আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে বিশাল গণেশ মূর্তি, লাফিং বুদ্ধ , মাইসুরু দশরা, চামুণ্ডেশ্বরী দেবী, রাজকীয় সিংহাসনে আসীন মহীশূরের রাজা নরসিংহ রাজা ওয়াদিয়ার, রথে আসীন ভগবান কৃষ্ণ ও অর্জুন (রথটি চারটি ঘোড়া দ্বারা চালিত)। গীতোপদেশ, বন্যপ্রাণী, প্রাচীন সভ্যতা, ডিজনিল্যান্ড, সামুদ্রিক জীবন, রাশিচক্র, ক্রিসমাস ও সান্তা ক্লজসহ নানা বিষয়ভিত্তিক ভাস্কর্য। প্রতিটি শিল্পকর্মই শুধুমাত্র বালি ও জল দিয়ে নির্মিত, যা শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

- অবস্থান: চামুণ্ডি হিল রোড, কে.সি. লেআউট, মাইসুরু, কর্ণাটক।
- সময়সূচি: প্রতিদিন সকাল ৮:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬:৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে।

সংগৃহীত

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর
সেন্ট ফিলোমেনা ক্যাথেড্রাল



Gunjan Guha

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



গথিক সৌন্দর্যের প্রার্থনালয়: মাইসুরুর সেন্ট ফিলোমেনা ক্যাথেড্রাল

মাইসুরুর আকাশরেখায় গথিক স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন হল সেন্ট ফিলোমেনা ক্যাথেড্রাল। রোমান ক্যাথলিক চার্চের ল্যাটিন ক্যাথলিক সন্ত সেন্ট ফিলোমেনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত এই বিশাল ও সুদৃশ্য গির্জাটি জার্মানির বিখ্যাত কোলোন ক্যাথেড্রালের আদলে তৈরি করা হয়েছে। এই ক্যাথেড্রালে সেন্ট ফিলোমেনার পবিত্র দেহাবশেষ সংরক্ষিত রয়েছে। সেন্ট ফিলোমেনা’স ক্যাথেড্রাল এশিয়ার অন্যতম উচ্চতম গির্জা।

ভিতরে প্রবেশ করলে চোখে পড়ে রঙিন স্টেইনড গ্লাসে অঙ্কিত যিশুখ্রিস্টের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, বিশাল নেভ (প্রার্থনাকক্ষ) এবং শান্ত-গম্ভীর ধর্মীয় পরিবেশ। মূল বেদির নিচে সেন্ট ফিলোমেনার স্মারক নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে।

চতুর্থ শতাব্দীর সন্ত ও শহীদ সেন্ট ফিলোমেনার স্মরণে ১৮৪৩ সালে মহীশূরের মহারাজা মুম্মুদি কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার সেন্ট ফিলোমেনা'স ক্যাথেড্রালটি নির্মাণ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহীশূরে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর জন্য উপহারস্বরূপ এই ক্যাথেড্রালটি তৈরি করা হয়েছিল। ইউরোপীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একটি বড় গির্জার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে মহীশূরের তৎকালীন রাজা কৃষ্ণরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার নতুন এই গির্জাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। জার্মানির কোলোন ক্যাথেড্রালের আদলে সেন্ট ফিলোমেনা'স ক্যাথেড্রালটির নকশা করেছিলেন ফরাসি স্থপতি ডালি (Daly)।

অমিতাভ বচ্চন অভিনীত ১৯৭৭ সালের বলিউড চলচ্চিত্র 'অমর আকবর অ্যান্টনি'-র বিভিন্ন দৃশ্যের শুটিং মহীশূরের সেন্ট ফিলোমেনা'স ক্যাথেড্রালে করা হয়েছিল।

- দর্শন সময়: সাধারণত ভোর ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

সংগৃহীত

ছবিঃ By Paweł 'pbm' Szubert (talk) - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58573973

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর
মাইসুরু প্রাসাদ ।
সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



Gunjan Guha



মাইসুরু প্রাসাদ: কর্ণাটকের রাজকীয় ঐতিহ্যের উজ্জ্বল প্রতীক।

মাইসুরু প্রাসাদ, যা অম্বা বিলাস প্রাসাদ নামেও পরিচিত, ভারতের অন্যতম দর্শনীয় রাজপ্রাসাদ এবং ওয়াড়িয়ার রাজবংশের প্রাক্তন রাজকীয় বাসভবন। ১৮৯৭ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে নির্মিত এই প্রাসাদটি ব্রিটিশ স্থপতি হেনরি আরউইনের নকশায় গড়ে ওঠে। এর স্থাপত্যশৈলীতে হিন্দু, ইসলামিক, রাজপুত ও গথিক রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে, যা 'ইন্দো-সারাসেনিক' স্থাপত্য নামে পরিচিত। প্রাসাদটি তার বিশাল গম্বুজ, সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত খিলান, রঙিন কাঁচের ছাদ এবং সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ সজ্জার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। এর প্রধান আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে রাজকীয় দরবার হল, ঐতিহাসিক সিংহাসন এবং ওয়াড়িয়ার রাজাদের ব্যবহৃত চিত্রকলা, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, প্রাসাদের মন্দিরসমূহ, পুতুলের প্যাভিলিয়ন (ডলস প্যাভিলিয়ন) ও নানা মূল্যবান নিদর্শনের সংগ্রহ।

সন্ধ্যা নামার পর মাইসুরু প্রাসাদের আরেকটি অনন্য রূপ দেখা যায়। ৯৭,০০০ বৈদ্যুতিক আলোর ঝলমলে সাজে আলোকিত হয়ে প্রাসাদটি যেন এক স্বপ্নলোকের আবহ সৃষ্টি করে। এছাড়াও বিশ্ববিখ্যাত মাইসুরু দশরা উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু এই প্রাসাদ। উৎসবের সময় এর জাঁকজমকপূর্ণ সজ্জা ও আলোকসজ্জা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

আজ মাইসুরু প্রাসাদ কর্ণাটকের রাজকীয় ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক গৌরবময় প্রতীক। এর স্থাপত্যের মহিমা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটককে আকর্ষণ করে।

ভ্রমণ তথ্য

- **অবস্থান:** মাইসুরু শহরের কেন্দ্রস্থল, কর্ণাটক।
- **দর্শনের উপযুক্ত সময়:** অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি।
- **সময় লাগবে:** প্রাসাদটি ঘুরে দেখতে সাধারণত ১–৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

সংগৃহীত

ছবিঃ By Basavaraj M - Own work, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153127302

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর ললিতা মহল প্যালেস হোটেল।



Gunjan Guha

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



সাদা গম্বুজে রাজকীয় স্মৃতি: মহীশূরের ললিতা মহল প্যালেস হোটেলের অমলিন ঐতিহ্য।

মহীশূরের রাজকীয় ঐতিহ্যের অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন ললিতা মহল প্যালেস হোটেল। এটি মহীশূরের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাসাদ এবং বর্তমানে একটি ঐতিহ্যবাহী (Heritage) বিলাসবহুল হোটেল। ১৯২১ সালে মহীশূরের মহারাজা Krishnaraja Wadiyar IV ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ও অন্যান্য বিশেষ রাজকীয় অতিথিদের আতিথ্যের জন্য এই প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৩১ সালে।

প্রাসাদটি ইতালীয় রেনেসাঁ শৈলীতে নির্মিত এবং এর বিশাল সাদা গম্বুজ, আইওনিক স্তম্ভ, প্রশস্ত সিঁড়ি ও সুসজ্জিত বারান্দা দর্শকদের মুগ্ধ করে। স্থাপত্যে St. Paul's Cathedral-এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইতালীয় পালাজ্জো ধাঁচের নকশা, বেলজিয়ান কাচ, ইতালীয় মার্বেল, গোলাপি কাঠের আসবাব ও অলঙ্কৃত ছাদ প্রাসাদের অভ্যন্তরকে আরও রাজকীয় করে তুলেছে।

প্রাসাদটির বিশেষ আকর্ষণ বিশাল কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও সাদা প্রাসাদের মনোমুগ্ধকর বহিরঙ্গ, ইতালীয় মার্বেলের বাঁকানো রাজকীয় সিঁড়ি, প্রাক্তন বলরুম, যা বর্তমানে একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ, রাজপরিবারের প্রতিকৃতি, প্রাচীন আসবাব ও ঐতিহাসিক অলংকরণ।

১৯৭৪ সালে প্রাসাদটিকে একটি হেরিটেজ হোটেলে রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে এখানে ঐতিহ্যবাহী কক্ষ, স্যুইট, রেস্তোরাঁ, সুইমিং পুল এবং নানা আধুনিক সুবিধা রয়েছে। রাজকীয় পরিবেশে থাকার অভিজ্ঞতা নিতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

প্রাসাদটি সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। তবে সাধারণ দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার সাধারণত গ্র্যান্ড লবি, বিখ্যাত মার্বেল সিঁড়ি এবং বাগানের মতো নির্দিষ্ট কিছু এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গেস্ট রুম এবং কিছু বিশেষ অংশ শুধুমাত্র হোটেলের অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত।

- প্রবেশমূল্য • দর্শনার্থী (যারা হোটেলের অতিথি নন): দর্শনের জন্য সাধারণত জনপ্রতি ১০০–১৫০ টাকা। হোটেলের বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী এই টাকার পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে।
- পরিদর্শনের উপযুক্ত সময় • পরিদর্শনের সময়: সাধারণত দিনের বেলা (সকাল ৯:০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টার মধ্যে)। তবে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান, বিয়ে বা চলচ্চিত্র শুটিংয়ের সময় হোটেল কর্তৃপক্ষ প্রবেশাধিকার সীমিত করতে পারে। তাই যাওয়ার আগে ফোন করে জেনে নেওয়া ভালো।
-

সংগৃহীত

ছবি: By G41rn8 - Own work, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44206958

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির।

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



Gunjan Guha



চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরঃ মহীশূরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পবিত্র ধাম।

রাজকীয় শহর মহীশূরের অনেক উঁচুতে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরটি শহরের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রবিন্দু এবং সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে বিরাজমান। মনোরম চামুণ্ডি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই পবিত্র তীর্থস্থানটি মহীশূরের কেবল আরেকটি সাধারণ মন্দির নয়; এটি যেন খোদ শহরেরই প্রাণস্পন্দন।

চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরটি দেবী চামুণ্ডেশ্বরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যিনি দেবী দুর্গারই এক উগ্র বা সংহারক রূপ। কিংবদন্তি অনুসারে, ঠিক এই স্থানেই মহিষাসুর নামক অসুরকে বধ করেছিলেন এবং 'মহিষাসুরমর্দিনী' নাম ধারণ করেছিলেন। মহীশূর শহরের নামটিও এসেছে এই পৌরাণিক কাহিনি থেকে; ফলে এই অঞ্চলের পরিচয়ের সাথে দেবী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছেন।

এখানে পূজা-অর্চনা চলছে এক হাজারেরও বেশি সময় ধরে। তবে ওডেয়ার রাজবংশের শাসনামলে মন্দিরটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে, তারা দেবীকে কুলদেবী বা পারিবারিক দেবতা হিসেবে মান্য করতেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১,০০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এই পাহাড় থেকে মহীশূরের প্রাসাদ, হ্রদ এবং জনপদগুলোর এক বিস্তৃত ও মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। দর্শনার্থীরা পাহাড়ের চূড়ায় আঁকাবাঁকা গাড়ি চলাচলের রাস্তা দিয়ে; অথবা বিখ্যাত ১,০০৮টি পাথরের সিঁড়ি বেয়ে— পৌঁছাতে পারেন । পাহাড়ের মাঝামাঝি পথে গ্রানাইট পাথরের একটি বিশাল খণ্ড দিয়ে খোদাই করা নন্দীর (ষাঁড়) মূর্তিটি যেন প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এটি শান্ত, শক্তিশালী এবং গভীর প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত।

মহীশূরের চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরের বর্তমান কাঠামোটি দ্রাবিড় স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। পরবর্তীকালে ওডেয়ার রাজবংশ এর সাথে আরও কিছু অংশ যুক্ত করে এর মহিমা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। মন্দিরটির সুউচ্চ সাত-স্তরের গোপুরম (প্রবেশদ্বার)—যা বিভিন্ন দেব-দেবী ও পৌরাণিক চরিত্রের রঙিন ভাস্কর্যে সুসজ্জিত—বহু দূর থেকেও দৃশ্যমান হয়। গর্ভগৃহের ভেতরে দেবী চামুণ্ডেশ্বরীর মূর্তিটি সোনার গয়নায় সুসজ্জিত—যার মধ্যে রয়েছে রাজপরিবারের উপহার হিসেবে পাওয়া একটি বিখ্যাত সোনার নাকছাবি। গর্ভগৃহটি ছোট ও নিভৃত হলেও এর পরিবেশ অত্যন্ত গভীর ও আধ্যাত্মিক; এটি বাইরের কোলাহল ও বিক্ষিপ্ততা থেকে মনকে সরিয়ে নিজের অন্তরের দিকে টেনে নেয়।

স্থানীয়দের কাছে মহীশূরের চামুণ্ডেশ্বরী কেবল কোনো দূরবর্তী দেবতা নন, বরং এক জীবন্ত সত্তা। নিত্য পূজা, ব্যক্তিগত মানত এবং পারিবারিক প্রথা—সবই এই মন্দিরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নবরাত্রির সময় এই মন্দিরটি মহীশূরের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বিশাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে দেবীর পূজা করা হয় এবং প্রদীপ, মন্ত্রোচ্চারণ ও উৎসবের আমেজে পুরো পাহাড়টি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে; এভাবেই রাজকীয় ঐতিহ্যের সাথে মানুষের জীবন্ত বিশ্বাসের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটে।

চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির, মহীশূর: দর্শনের সময়সূচি

সকাল: সকাল ৭:৩০ – দুপুর ২:০০

বিকাল: বিকাল ৩:৩০ – সন্ধ্যা ৬:০০

বিশেষ পূজা ও উৎসব: বর্ধিত সময়

সংগৃহীত

ছবিঃ কর্ণাটক ট্যুরিজিম ।

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর

হিমাবদ গোপালস্বামী বেট্টা ।

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



Gunjan Guha



হিমাবদ গোপালস্বামী বেট্টা : মেঘ, অরণ্য ও ভগবান কৃষ্ণের অপূর্ব মিলন ।

কর্নাটকের চামরাজনগর জেলার বান্দিপুর টাইগার রিজার্ভের অন্তঃস্থলে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১,৪৫০ মিটার উচ্চতায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হিমাবদ গোপালস্বামী বেট্টা। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম মনোরম এই পাহাড়ি তীর্থস্থান যেন প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য মিলনভূমি। বছরের অধিকাংশ সময়ই ঘন কুয়াশার সাদা চাদরে মোড়া থাকে পাহাড়টি। কন্নড় ভাষায় 'হিমাবদ' অর্থ কুয়াশাচ্ছন্ন এবং 'বেট্টা' অর্থ পাহাড়—নামটির মধ্যেই যেন লুকিয়ে রয়েছে এর প্রকৃত পরিচয়।

পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত প্রাচীন শ্রী ভেণুগোপালস্বামী মন্দির, যেখানে বাঁশিবাদক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী ও সত্যভামার সঙ্গে অধিষ্ঠিত। প্রায় সাত শতাব্দী প্রাচীন এই মন্দিরটি ১৪শ শতকে নির্মিত বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। পরবর্তীকালে হোয়সালা ও মাইসোর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এর সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়। আজও মন্দিরটি ভক্তদের কাছে যেমন পূজনীয়, তেমনি ইতিহাস ও স্থাপত্যপ্রেমীদের কাছেও সমান আকর্ষণের কেন্দ্র।

হিমাবদ গোপালস্বামী বেট্টার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার অনুপম প্রাকৃতিক পরিবেশ। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে চোখের সামনে ধরা দেয় বান্দিপুরের বিস্তীর্ণ সবুজ অরণ্য। এই বনভূমি হাতি, গৌর, চিতল হরিণ, নানান প্রজাতির পাখি এবং সৌভাগ্য অনুকূলে থাকলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারেরও আবাসস্থল। সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের সময় পাহাড়ের গায়ে আলো-ছায়ার অপূর্ব খেলা এবং কুয়াশার রহস্যময় আবরণ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা উপহার দেয়।

ধর্মীয় আবহ, পাহাড়ি নিসর্গ, অরণ্যের নৈঃশব্দ্য এবং বন্যপ্রাণের সহাবস্থান—সব মিলিয়ে হিমাবদ গোপালস্বামী বেট্টা এমন এক গন্তব্য, যা প্রকৃতিপ্রেমী, আলোকচিত্রী, ভ্রমণপিপাসু ও তীর্থযাত্রী—সবার মনেই সমানভাবে দাগ কেটে যায়।

কীভাবে যাবেন

·মাইসুরু থেকে: প্রায় ৭৫–৮০ কিলোমিটার।

বান্দিপুর থেকে: প্রায় ১৯ কিলোমিটার।

বেঙ্গালুরু থেকে: প্রায় ২২০ কিলোমিটার।

- দর্শন সময়

সাধারণত সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। যেহেতু পাহাড়টি বান্দিপুর টাইগার রিজার্ভের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাই বনদপ্তরের নির্ধারিত সময়ের পর প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং রাতযাপনের অনুমতি নেই। ভ্রমণের আগে সর্বশেষ প্রবেশ ও দর্শনের সময় জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংগৃহীত

ছবিঃ MaximusPrasad - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153263299

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর ফোকলোর মিউজিয়াম ।



Gunjan Guha

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



ফোকলোর মিউজিয়াম (মাইসুরু): কর্ণাটকের লোকঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

একটি রাজকীয় প্রাসাদের অন্দরে যেন লুকিয়ে আছে কর্ণাটকের লোকজ জীবনের হাজারো গল্প। গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, শিল্প, সংগীত ও ঐতিহ্যের এক অনন্য ভাণ্ডার— মাইসুরুর ফোকলোর মিউজিয়াম। ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি যাদের গভীর আগ্রহ, তাদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক অনবদ্য গন্তব্য। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরটি মাইসুরুর ইউনিভার্সিটি অব মাইসোরের মানসগঙ্গোত্রী ক্যাম্পাসে অবস্থিত ঐতিহাসিক জয়লক্ষ্মী বিলাস ম্যানশন-এ গড়ে উঠেছে। একসময়ের রাজকীয় আবাস আজ পরিণত হয়েছে লোকঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ সংগ্রহশালায়, যেখানে কর্ণাটকের গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির দীর্ঘ বিবর্তনের অসংখ্য স্মারক সযত্নে সংরক্ষিত।

জাদুঘরে রয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি লোকঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। মুখোশ, পুতুল, পাপেট, যক্ষগানের বর্ণাঢ্য পোশাক, কথাকলির অলংকৃত সাজসজ্জা, কিন্নারি, চৌডিকে ও তাম্বুরির মতো ঐতিহ্যবাহী লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকদেবতার প্রতিমা, রাজা-রানি ও সৈনিকদের ক্ষুদ্র ভাস্কর্য, কৃষক ও বিভিন্ন কারিগর সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত সরঞ্জাম, গৃহস্থালির প্রাচীন সামগ্রী এবং বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারার নিদর্শন— প্রতিটি সংগ্রহই অতীতের এক একটি জীবন্ত দলিল।

জাদুঘরের অন্যতম আকর্ষণ এর আবহ। প্রবেশপথে দর্শনার্থীদের স্বাগত জানায় একটি বিশাল কাঠের রথ ও টেরাকোটার ভাস্কর্য। ভিতরে একের পর এক গ্যালারিতে ফুটে ওঠে কর্ণাটকের লোকজ সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ— কোথাও উৎসবের রঙ, কোথাও লোকনৃত্যের ছন্দ, কোথাও আবার গ্রামীণ জীবনের সরল অথচ গভীর সৌন্দর্য। মনে হয়, ইতিহাস যেন এখানে কেবল প্রদর্শিত নয়, জীবন্ত হয়ে কথা বলে।

দর্শন-তথ্য

অবস্থান: মানসগঙ্গোত্রী ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব মাইসোর, মাইসুরু

শহরের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব: প্রায় ৬ কিলোমিটার

নিকটতম রেলস্টেশন: মাইসুরু জংশন

নিকটতম বিমানবন্দর: মাইসুরু বিমানবন্দর (বিকল্প: বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর)

দর্শনের সময়: সাধারণত সকাল ৮:৩০টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা (ভ্রমণের আগে সময়সূচি যাচাই করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়)।

কীভাবে যাবেন

মাইসুরু শহরের যেকোনো প্রান্ত থেকে ট্যাক্সি, অটো-রিকশা বা সিটি বাসে সহজেই মানসগঙ্গোত্রী ক্যাম্পাসে পৌঁছানো যায়। ক্যাম্পাসের মধ্যেই অবস্থিত জয়লক্ষ্মী বিলাস ম্যানশনেই এই অনন্য জাদুঘরের অবস্থান।

সংগৃহীতঃ কর্ণাটক ট্যুরিজিম।

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর
বৃন্দাবন গার্ডেনস ।



Gunjan Guha

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



বৃন্দাবন গার্ডেনস: আলো, জল আর সবুজের অপূর্ব সমন্বয় ।

কর্ণাটকের মাইসুরু (মহীশূর) শহর থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে বৃন্দাবন গার্ডেনস ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ও নান্দনিক উদ্যান। কাবেরী নদীর উপর নির্মিত কৃষ্ণ রাজা সাগর বাঁধ (KRS বাঁধ)এর পাদদেশে অবস্থিত এই সুদৃশ্য বাগানটি তার সুনিপুণ নকশা, রঙিন আলোকসজ্জা, সঙ্গীতানুষ্ঠানভিত্তিক ফোয়ারা এবং মনোমুগ্ধকর পরিবেশের জন্য বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

১৯২৭ সালে এই উদ্যানের নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ১৯৩২ সালে তা সম্পূর্ণ হয়। মাইসোর রাজ্যের তৎকালীন দেওয়ান স্যার মির্জা ইসমাইল-এর পরিকল্পনা ও উদ্যোগে এটি গড়ে ওঠে। মুঘল উদ্যানশৈলীর অনুপ্রেরণায় নির্মিত এই বাগানে রয়েছে ধাপে ধাপে সাজানো সবুজ লন, নান্দনিক ফুলের বাগান, জলধারা, শোভাময় বৃক্ষরাজি এবং প্রশস্ত হাঁটার পথ।

সূর্যাস্তের পর বৃন্দাবন গার্ডেনস যেন এক নতুন রূপ ধারণ করে। সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষণ হলো রঙিন আলোর সঙ্গে সুরের তালে তালে নৃত্যরত মিউজিক্যাল ফাউন্টেন। জল, আলো ও সংগীতের এই অনবদ্য সমন্বয় দর্শকদের মুগ্ধ করে এবং ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তোলে।

যাঁরা প্রকৃতি, বাগান, আলোকসজ্জা এবং শান্ত পরিবেশে সময় কাটাতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য বৃন্দাবন গার্ডেনস একটি আদর্শ গন্তব্য। দিনের বেলায় সবুজের সমারোহ আর সন্ধ্যায় রঙিন আলোর উৎসব—দুটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা একসঙ্গেই উপভোগ করা যায় এখানে। পরিবার, বন্ধু কিংবা একান্তে—সব ধরনের ভ্রমণের জন্যই এটি সমান আকর্ষণীয়।

ভ্রমণ তথ্য

- অবস্থান: মাণ্ড্য জেলা, কর্ণাটক (মাইসুরু থেকে প্রায় ২১ কিমি)
- নিকটতম রেলস্টেশন: মাইসুরু জংশন
- নিকটতম বিমানবন্দর: মাইসুরু বিমানবন্দর; বিকল্প হিসেবে বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- ভ্রমণের সেরা সময়: অক্টোবর থেকে মার্চ
- বিশেষ আকর্ষণ: সন্ধ্যার মিউজিক্যাল ফাউন্টেন, আলোকসজ্জা, KRS বাঁধ, নৌবিহার ও সুপরিকল্পিত উদ্যান

সংগৃহীত : কর্ণাটক ট্যুরিজিম।

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর রঙ্গনাথিত্তু পক্ষী অভয়ারণ্য ।



Gunjan Guha

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



রঙ্গনাথিত্তু পক্ষী অভয়ারণ্য : কাবেরীর বুকে পাখিদের স্বর্গরাজ্য ।

কর্ণাটকের মাণ্ড্যা (Mandya) জেলায়, কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত রঙ্গনাথিত্তু পক্ষী অভয়ারণ্যটি মাইসুরু (Mysuru) শহর থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার এবং শ্রীরঙ্গপত্তন (Srirangapatna) থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বেঙ্গালুরু থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। সড়কপথে সহজেই এখানে পৌঁছানো যায়, এবং মাইসুরু বা বেঙ্গালুরু থেকে একদিনের ভ্রমণের জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গন্তব্য।

বিখ্যাত পক্ষীবিশারদ ড. সেলিম আলীর উদ্যোগে ১৯৪০ সালে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত রঙ্গনাথিত্তু পক্ষী অভয়ারণ্য পক্ষীপ্রেমী ও প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এক অনন্য আকর্ষণ। কর্ণাটকের মাণ্ড্যা জেলায় কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত এই অভয়ারণ্যটি প্রায় ০.৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। নদীর বুকে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট দ্বীপ এবং সবুজ পরিবেশ মিলিয়ে এটি পরিযায়ী ও দেশীয় অসংখ্য পাখির নিরাপদ প্রজনন ও আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

রঙ্গনাথিত্তুতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৭০টি প্রজাতির পাখি নথিভুক্ত হয়েছে। এখানে সচরাচর দেখা যায় পেইন্টেড স্টর্ক (রঙিন সারস), স্পট-বিল্ড পেলিকান, কিংফিশার (মাছরাঙা), করমোরেন্ট (পানকৌড়ি), ডার্টার (স্নেক বার্ড), হেরন (বক), এগ্রেট (সাদা বক), রিভার টার্ন, ইন্ডিয়ান রোলার (নীলকণ্ঠ), ব্ল্যাক-হেডেড আইবিস, স্পুনবিল এবং গ্রেট স্টোন প্লোভার। প্রজনন মৌসুমে হাজার হাজার পাখির সমাগমে অভয়ারণ্যটি যেন এক জীবন্ত পাখিরাজ্যে পরিণত হয়।

রঙ্গনাথিত্তুর প্রধান আকর্ষণ হলো নৌকাবিহার। অভিজ্ঞ গাইডের সঙ্গে নৌকায় করে অভয়ারণ্যের বিভিন্ন দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে পাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে দেখা যায়। প্রশিক্ষিত গাইডরা বিভিন্ন পাখি শনাক্ত করতে এবং তাদের জীবনচক্র ও আচরণ সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্য জানাতে সাহায্য করেন। নৌভ্রমণের সময় কাবেরীর জলে মার্শ ক্রোকোডাইল (মাগর কুমির) দেখার সুযোগও মিলতে পারে, যা এই ভ্রমণকে আরও রোমাঞ্চকর করে তোলে।

- পরিদর্শনের সময়সূচি

রঙ্গনাথিত্তু পক্ষী অভয়ারণ্য প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। শীতকাল এবং পরিযায়ী পাখির আগমনের মৌসুমে (প্রায় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) এই অভয়ারণ্য ভ্রমণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

- প্রবেশমূল্য (Entry Fee) (ভারতীয় নাগরিকদের জন্য)

প্রাপ্তবয়স্ক: ₹১০০ (প্রায়)

শিশু (৫–১২ বছর): ₹৩০ (প্রায়)

৫ বছরের নিচে শিশু: বিনামূল্যে

- নৌকাবিহারের চার্জ (Boat Safari) (ঐচ্ছিক)

প্রাপ্তবয়স্ক: ₹১০০–₹১৫০ (মৌসুম ও নৌকার ধরন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে)

শিশু: ₹৫০–₹১০০ (প্রায়)

- দ্রষ্টব্য: প্রবেশমূল্য ও নৌকাবিহারের চার্জ সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। ভ্রমণের আগে সর্বশেষ তথ্য জেনে নেওয়া ভালো।

সংগৃহীত

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর রেলওয়ে মিউজিয়াম ।



Gunjan Guha

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



রেলওয়ে মিউজিয়াম, মহীশূর - ভারতীয় রেলের গৌরবময় ইতিহাসের এক অনন্য সংগ্রহশালা।

কর্ণাটকের মহীশূর শহরে কৃষ্ণরাজা সাগর (KRS) রোডে অবস্থিত রেলওয়ে মিউজিয়াম, মহীশূর ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় রেল ঐতিহ্য সংগ্রহশালা। ১৯৭৯ সালে ভারতীয় রেলওয়ে এই জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করে। দিল্লির ন্যাশনাল রেলওয়ে মিউজিয়ামের পর এটিই ছিল দেশের দ্বিতীয় রেলওয়ে জাদুঘর। ঐতিহাসিক বাষ্পচালিত লোকোমোটিভ, রাজকীয় কোচ, রেল-মোটর কার, পুরোনো সিগন্যাল ব্যবস্থা এবং ভারতীয় রেলের বিকাশের ইতিহাস এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

জাদুঘরটি সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (CFTRI)-এর ঠিক বিপরীতে অবস্থিত। খোলা আকাশের নিচে সংরক্ষিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক লোকোমোটিভ ও কোচের পাশাপাশি একটি গ্যালারিতে রেলওয়ের বিবর্তনের আলোকচিত্র, মানচিত্র ও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। শিশুদের বিনোদনের জন্য রয়েছে একটি ব্যাটারি-চালিত মিনি ট্রেন, যা জাদুঘর প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে।

- প্রধান আকর্ষণ
- ES 506 (4-6-2) বাষ্পচালিত লোকোমোটিভ

জাদুঘরের প্রবেশপথেই দর্শনার্থীদের স্বাগত জানায় ES 506 (4-6-2) মডেলের ঐতিহাসিক লোকোমোটিভ। এটি মহীশূর স্টেট রেলওয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিন। ১৯২২ সালে ইংল্যান্ডের Kerr, Stuart & Co. Ltd. এটি নির্মাণ করে। ব্যাঙ্গালোর–বাঙ্গারাপেট লাইনে যাত্রী ও মালবাহী উভয় ধরনের ট্রেন পরিচালনায় এই ইঞ্জিন ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে এটি কোলার জেলা ও ব্যাঙ্গালোর–চিকবাল্লাপুর রেলপথেও চলাচল করে।

- অস্টিন রেল-মোটর কার

১৯২৫ সালের একটি Austin মোটরগাড়িকে রেলের উপযোগী করে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। গাড়িটির স্টিয়ারিং ব্যবস্থা অপসারণ করে বিশেষ রেলচাকা বসানো হয়। পরিদর্শক কর্মকর্তাদের রেলপথ পরিদর্শনের কাজে এটি ব্যবহৃত হতো এবং এতে একসঙ্গে ছয়জন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারতেন। আজ এটি জাদুঘরের অন্যতম আকর্ষণ।

- রাজকীয় কোচ ও মহারানি সেলুন

মহীশূরের মহারাজার ব্যবহৃত দুটি রাজকীয় কোচ এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মহারানি সেলুন', যা ১৮৯৯ সালে নির্মিত। এই বিলাসবহুল বগির ভেতরে রান্নাঘর, ডাইনিং রুম, শয়নকক্ষ এবং রাজকীয় শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিল। তৎকালীন রাজপরিবারের রেলযাত্রার ঐশ্বর্য আজও এই কোচে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

- পরিদর্শনকারী রেলগাড়ি (Inspection Cars)

জাদুঘরে সংরক্ষিত একাধিক পরিদর্শনকারী রেলগাড়ি রেলওয়ে কর্মকর্তাদের ব্যবহারের ইতিহাস বহন করে। এর মধ্যে একটি বর্তমানে টিকিট কাউন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বিষয়।

- উল্লেখযোগ্য লোকোমোটিভ
- W.G. Bagnall #1625 (2-4-2ST)

১৯০০ সালে ইংল্যান্ডের W.G. Bagnall Ltd. এই ন্যারো গেজ ট্যাঙ্ক লোকোমোটিভটি নির্মাণ করে। প্রথমে এটি খুশলগড়–কোহাট–থাল সামরিক সীমান্ত রেলপথে ব্যবহৃত হয়। পরে নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, মারালা টিম্বার ডিপো এবং ধিলওয়ান ক্রেওসোটিং প্ল্যান্টে দীর্ঘদিন পরিষেবা দেয়। ২ ফুট ৬ ইঞ্চি গেজের এই লোকোমোটিভটি কয়লার পরিবর্তে কাঠ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করতে পারত।

১৯২০ সালে North British Locomotive Company নির্মিত এই লোকোমোটিভটি সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ের জন্য তৈরি হয়েছিল। তিনটি সুপারহিটেড লোকোমোটিভের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম এবং তৎকালীন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

১৯৩২ সালে মহীশূর স্টেট রেলওয়ের জন্য W.G. Bagnall Ltd. এই মিটার গেজ ট্যাঙ্ক ইঞ্জিনটি নির্মাণ করে। এটি মূলত ব্যাঙ্গালোর–তুমকুর লাইনে ধীরগতির যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনায় ব্যবহৃত হতো এবং শহরতলির পরিষেবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

- YP 2511 মিটার গেজ লোকোমোটিভ

১৯৬৩ সালে TELCO নির্মিত YP 2511 ভারতের অন্যতম পরিচিত মিটার গেজ বাষ্পচালিত লোকোমোটিভ। এর বয়লারটি ১৯৫৭ সালে নির্মিত হয়েছিল এবং বয়লার নম্বর ছিল ২৩৫২। শক্তিশালী নির্মাণ ও নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতার জন্য YP শ্রেণির ইঞ্জিন ভারতীয় রেলের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

- অন্যান্য প্রদর্শনী

জাদুঘরে বিভিন্ন ধরনের রেলওয়ে সিগন্যাল, লণ্ঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুরোনো যন্ত্রপাতি, স্টেশন সামগ্রী এবং ভারতীয় রেলের বিভিন্ন যুগের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়। এসব প্রদর্শনী ভারতীয় রেলব্যবস্থার প্রযুক্তিগত বিবর্তন এবং ঐতিহাসিক অগ্রগতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে।

শিশুদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

পরিবার নিয়ে বেড়াতে এলে শিশুদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো ব্যাটারি-চালিত মিনি ট্রেন রাইড। ছোট্ট এই ট্রেনটি জাদুঘর প্রাঙ্গণ ঘুরিয়ে দেখায় এবং শিশুদের রেলভ্রমণের একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা দেয়। রেলওয়ে মিউজিয়াম, মহীশূর কেবল একটি জাদুঘর নয়; এটি ভারতীয় রেলের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। ভিন্টেজ লোকোমোটিভ, রাজকীয় সেলুন, বিরল রেল-মোটর কার এবং শতবর্ষ পুরোনো রেল-উপকরণ ইতিহাসপ্রেমী, প্রকৌশল শিক্ষার্থী, রেলপ্রেমী এবং শিশু—সবার কাছেই সমানভাবে আকর্ষণীয়। মহীশূর ভ্রমণে এই জাদুঘর নিঃসন্দেহে একটি অবশ্যদ্রষ্টব্য স্থান।

- ভ্রমণ তথ্য

অবস্থান: KRS Road, CFTRI-এর বিপরীতে, মহীশূর, কর্ণাটক

নিকটতম রেলস্টেশন: Mysuru Junction (প্রায় ৩ কিমি)

নিকটতম বিমানবন্দর: Mysore Airport (প্রায় ১২ কিমি)

ভ্রমণের উপযুক্ত সময়: অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি

সময় লাগবে: ১.৫–২ ঘণ্টা

সংগৃহীত

ছবি সৌজন্য

- By Cleanrailwaymysuru - Own work, CC BY-SA 4.0

সুচিপত্র

কর্ণাটকঃ মহীশূর মেলোডি ওয়ার্ল্ড ওয়াক্স মিউজিয়াম ।

সংকলকঃ গুঞ্জন গুহ



Gunjan Guha



মেলোডি ওয়ার্ল্ড ওয়াক্স মিউজিয়াম, মাইসোর ।

মাইসোরের অন্যতম আকর্ষণীয় জাদুঘর মেলোডি ওয়ার্ল্ড ওয়াক্স মিউজিয়াম মূলত সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি অনন্য মোমের জাদুঘর। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতশিল্পী, বাদ্যযন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে বাস্তবসম্মত মোমের মূর্তির মাধ্যমে। ২০১০ সালে শিল্পী শ্রীজি ভাস্করণ (Shreeji Bhaskaran) এই জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো একটি ঐতিহ্যবাহী ভবনে জাদুঘরের বিশেষ আকর্ষণ হল - ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহশালা—যাতে বর্তমানে ১,৮০০টিরও বেশি বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। রয়েছে প্রায় ১০০টিরও বেশি জীবন-আকারের (Life-size) মোমের মূর্তি, ১৯টি থিমভিত্তিক গ্যালারিতে ভারতীয় শাস্ত্রীয়, কর্ণাটকী, হিন্দুস্তানি, ভাংড়া, উপজাতীয়, জ্যাজ, রক, হিপ-হপ, মধ্যপ্রাচ্য, চীনা ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পরিবেশনা তুলে ধরা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, মাইসোরের মহারাজা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মোমের মূর্তিও দর্শকদের আকর্ষণ করে।

যদি আপনি সঙ্গীত, শিল্প, ফটোগ্রাফি বা ব্যতিক্রমী জাদুঘর দেখতে ভালোবাসেন, তবে মেলোডি ওয়ার্ল্ড ওয়াক্স মিউজিয়াম আপনার জন্য একটি চমৎকার গন্তব্য। এখানে শুধু মোমের মূর্তি নয়, বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত ঐতিহ্য ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যায়। পরিবার, শিশু এবং সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এটি মাইসোর ভ্রমণের অন্যতম সেরা আকর্ষণ।

চামুন্ডি হিলের পথে, মাইসোর প্যালেস থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হওয়ায় সহজেই অটো, ট্যাক্সি বা ব্যক্তিগত গাড়িতে পৌঁছানো যায়।

দর্শনের সময়ঃ প্রতিদিন সকাল ৯:৩০টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

প্রবেশমূল্যঃ বর্তমান জনপ্রিয় পর্যটন তথ্য অনুযায়ী সাধারণ প্রবেশমূল্য প্রায় ₹৬০ (সময়ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে)।

ছবি সৌজন্য – Museum of India

সংগৃহীত।

সুচিপত্র



একটি কাগজের পাতায় পরিচিত কোন আকৃতি বা নতুন কোন সৃজনে নানান রঙ ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু এই ভাবনাটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেটি শুধু রঙের সমষ্টিবিন্দুর চেয়ে ঢের বেশি। ছবি দখল করে নেয় মন ও হৃদয়ের বহুল অংশ, এমনকি একটি সাধারন ছবিতেও কোন না কোন গল্প জড়িত থাকে । ছবি দিয়ে যায় নিত্য বাস্তব জগত থেকে পলায়নের এক পথ। এক বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত সৃষ্টি জানিয়ে দিয়ে যায় প্রতিক্ষন ও আবেগের এক বিস্তারিত বিবরণ।

ক্যামেরা ছাড়া ভ্রমণ ভাবাই যায় না। মনোরম, বিস্ময়কর স্থানের ছবি তুলে ভবিষ্যৎ ও অতীতকে জুরে দেওয়া যায় এক সুত্রে। ফটোগ্রাফি শুধু এক ছবি নয় ফটোগ্রাফি অনুভূতি, স্পর্শ, ভালবাসার একটি উপায়। যা আজ ধরা থাকছে তা চিরকালের জন্য বন্দী হয়ে গেছে । ফটোগ্রাফি মনে রাখে প্রতিটি মুহূর্ত, সবকিছু ভুলে যাওয়ার অনেক পরেও। ফটোগ্রাফি এমন এক গল্প যা কথায় ব্যাক্ত করা যায় না।

“ভ্রাম্যমাণের চিত্রালয়” এই বিভাগে রয়েছে গ্রুপের সদস্যদের পোস্ট করা সেইরকম অসংখ্য অমূল্য ছবি।

Haflong

সুদীপ কুমার রায়ের ক্যামেরায়



Sudip K Roy

Haflong

Haflong is a picturesque hill station in Assam and serves as the headquarters of the Dima Hasao District. Situated at an elevation of about 680 metres (2,230 feet) above sea level, it is the only hill station in Assam. Surrounded by rolling hills, lush forests, and scenic valleys, Haflong is renowned for its pleasant climate, natural beauty, and rich tribal culture.

It's Assam's only hill station, celebrated for its tranquil lake, scenic hills, pleasant climate, and vibrant tribal heritage.




I HAFLONG
21 June 2026




22 June 2026


22 June 2026


22 June 2026


I DIMA HASAO
22 June 2026


22 June 2026


23 June 2026


23 June 2026


23 June 2026


23 June 2026


23 June 2026


23 June 2026



Selected Comments

Prajnaparamita Dutta · 5w
Natures canvas and sound of tha nature... beautiful
Reply Share

Ghosh Ruchismita · 5w
So beautiful.
Reply Share

Gunjan G Traveler · 5w
Beautiful pics beautiful information
Reply Share

সুচিপত্র

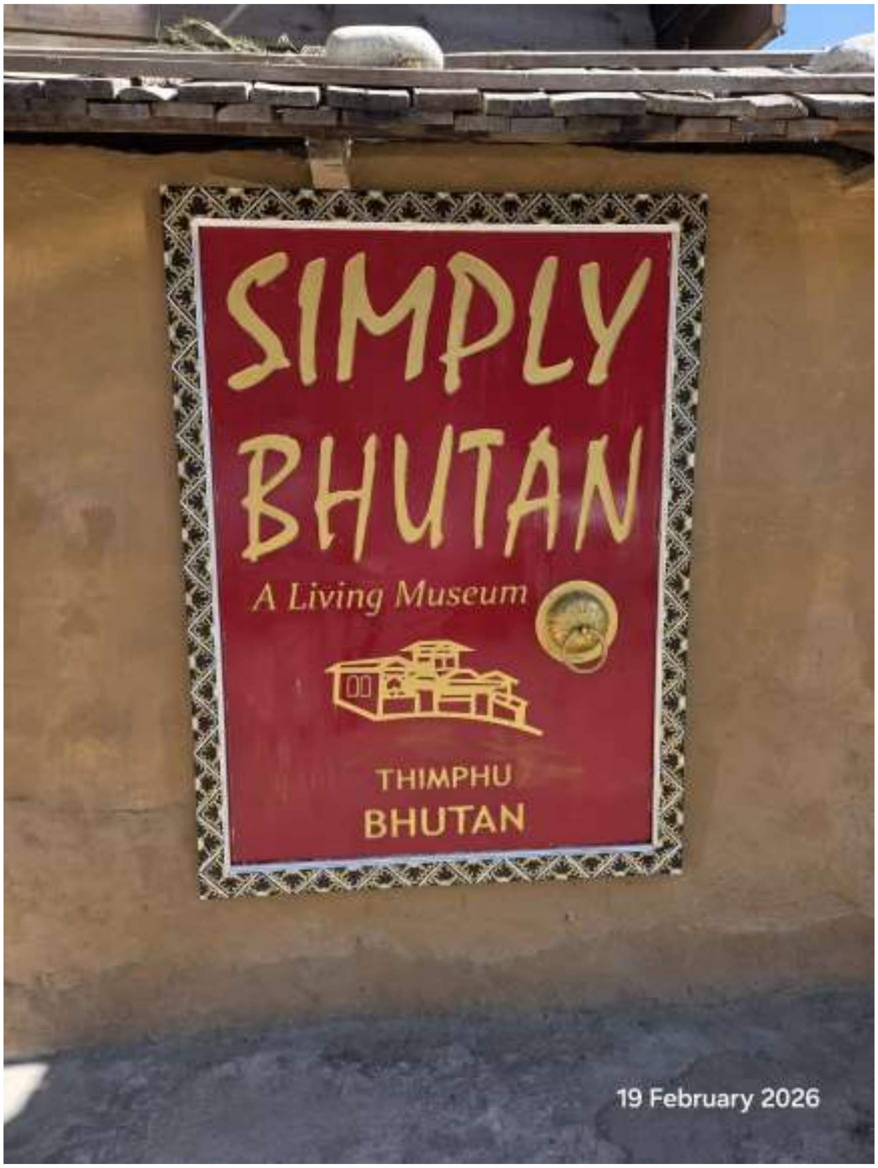
Bhutan



Sudip K Roy

সুদীপ কুমার রায়ের ক্যামেরায়

Bhutan Trip in February 2026




17 February 2026


20 February 2026

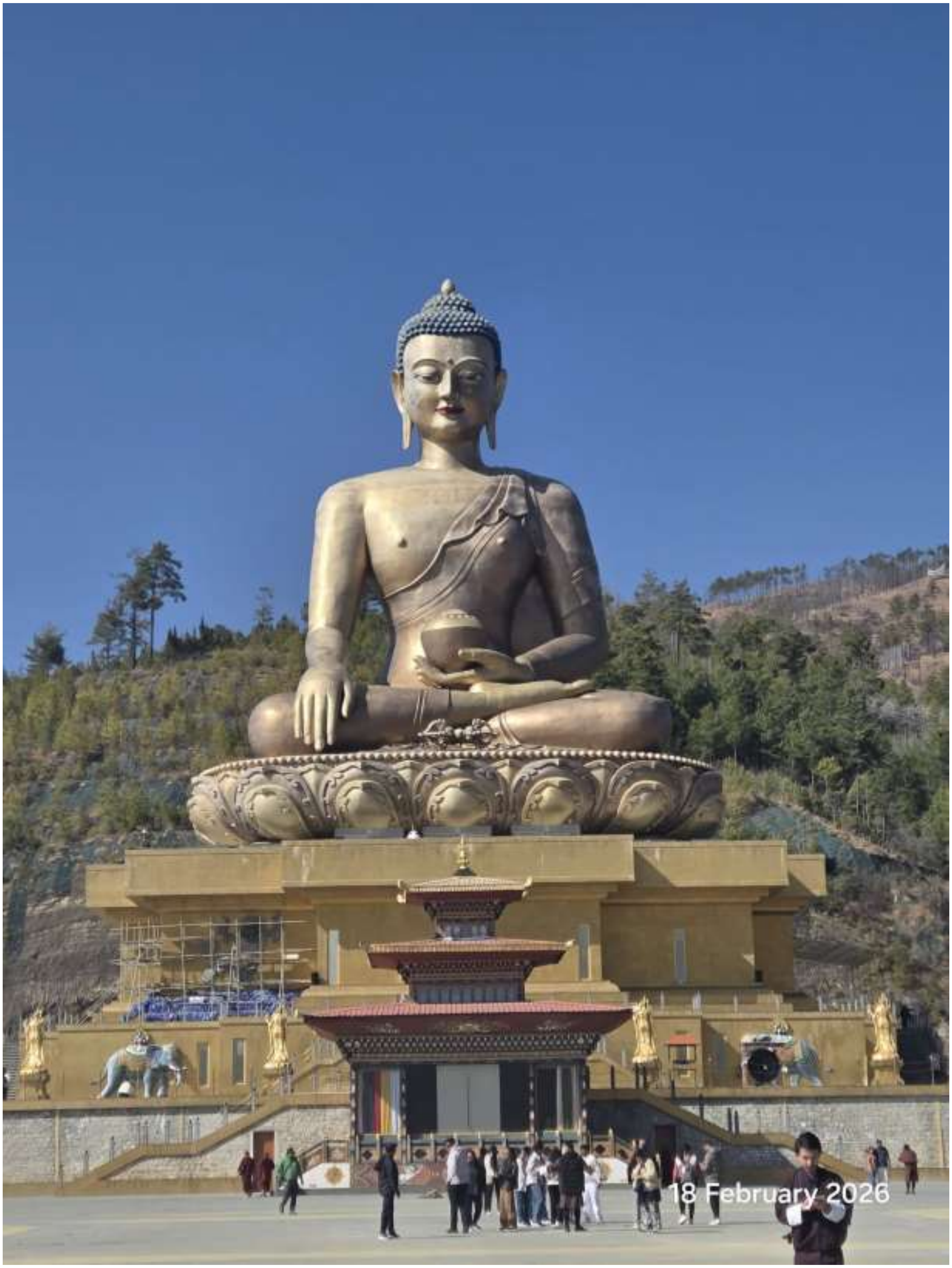

16 February 2026

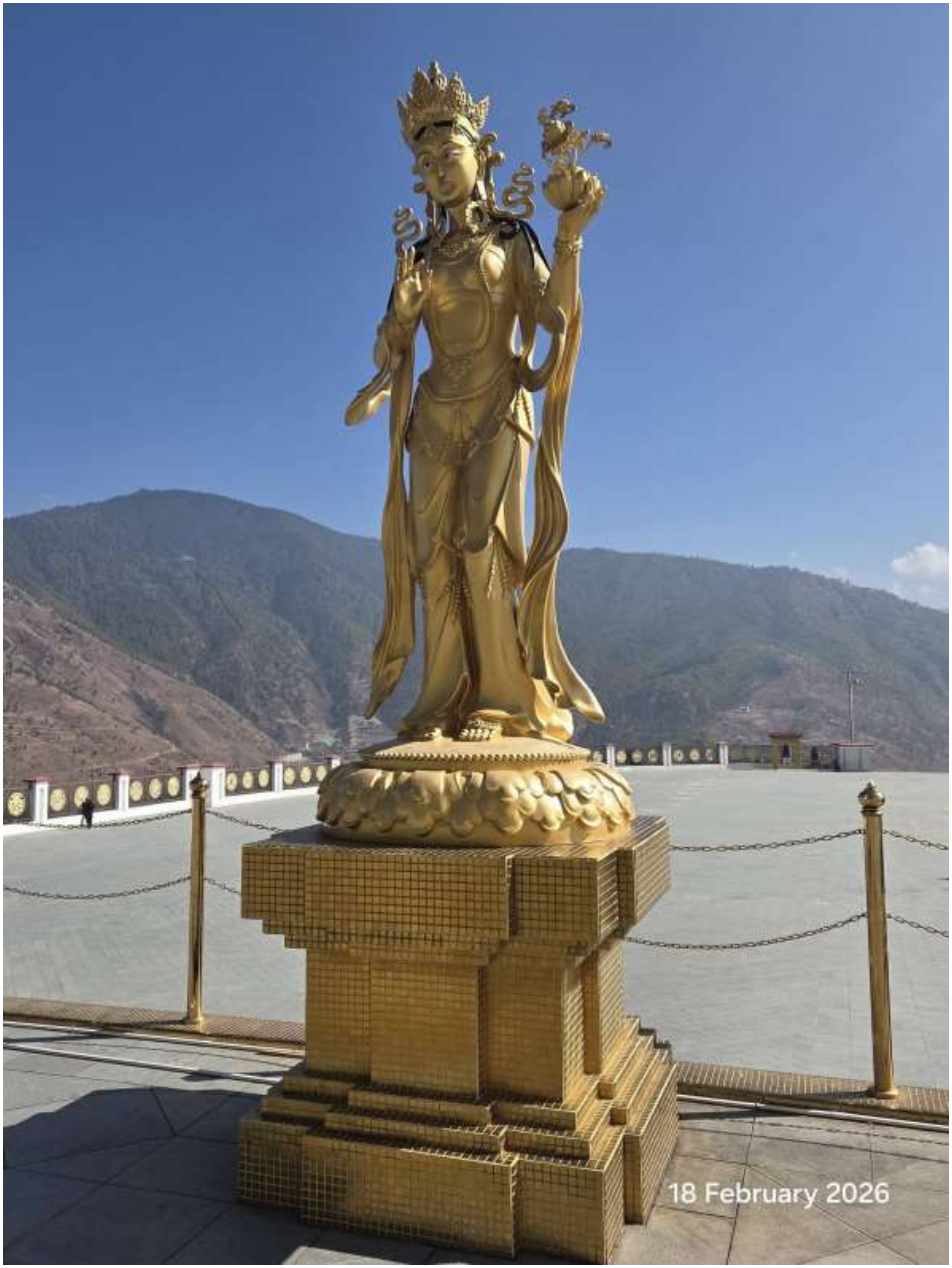

17 February 2026

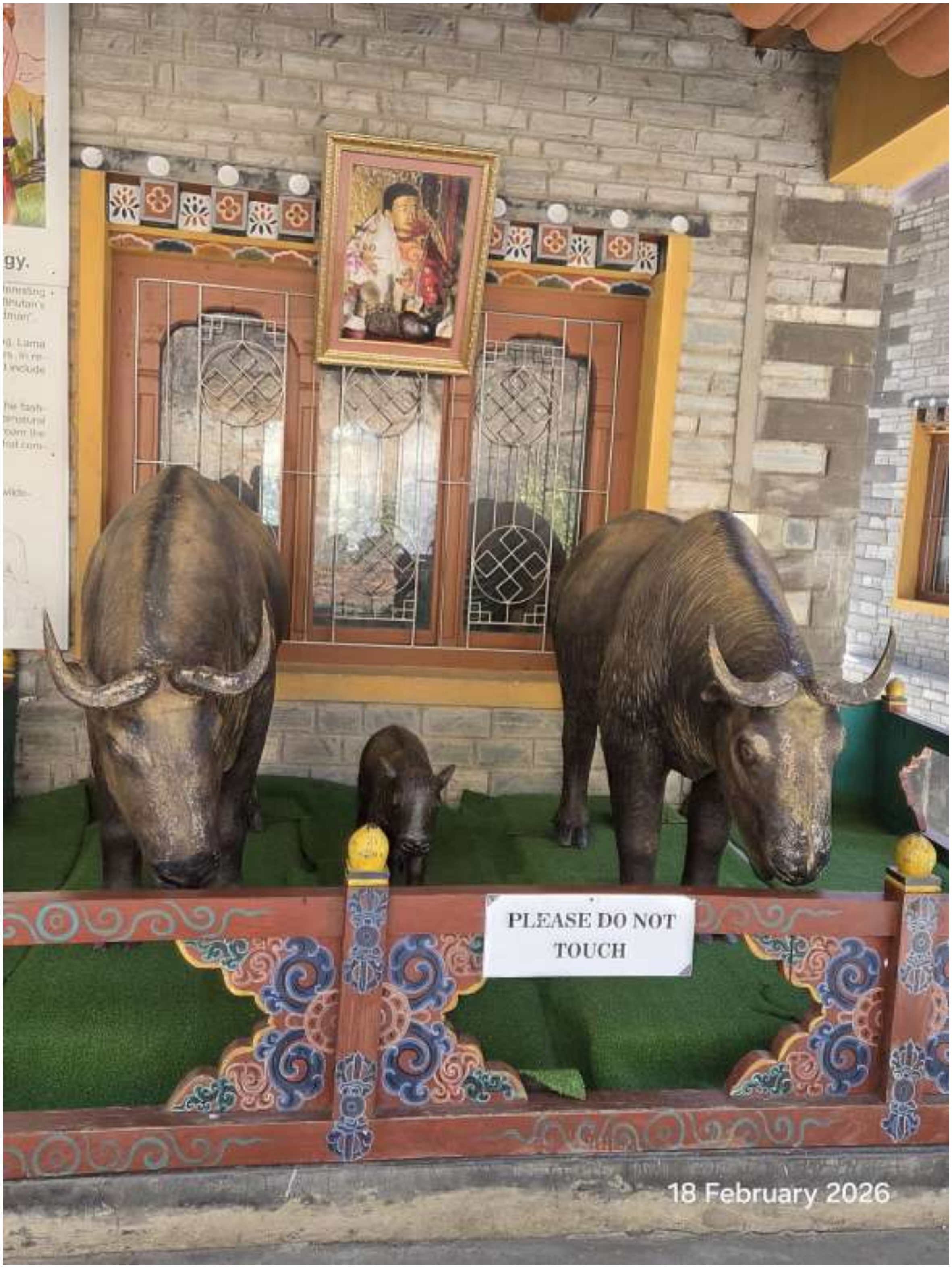

17 February 2026


17 February 2026


19 February 2026


18 February 2026


18 February 2026

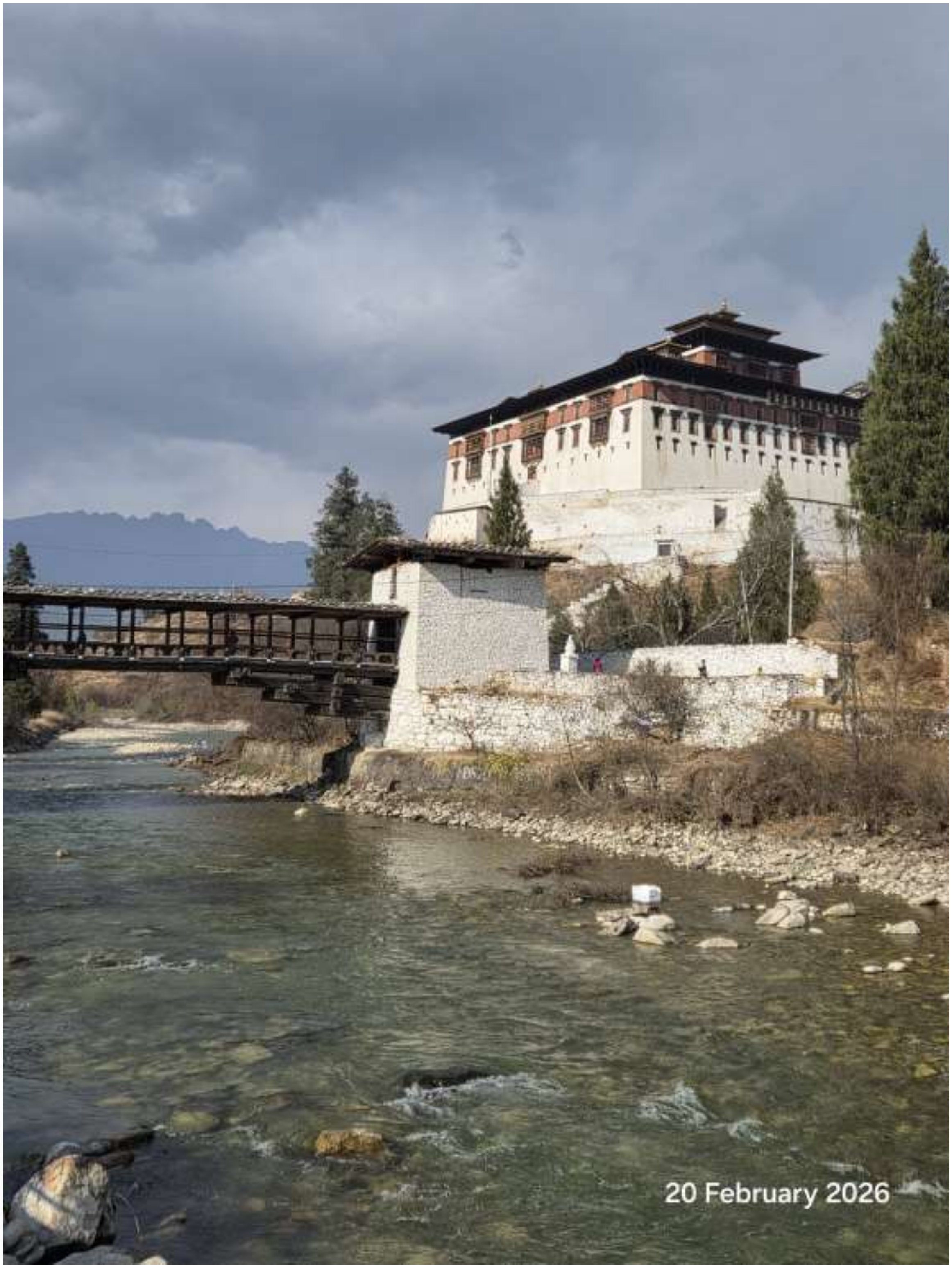

PLEASE DO NOT TOUCH
18 February 2026


18 February 2026


19 February 2026


19 February 2026


20 February 2026


20 February 2026


EXIT





Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 9w
Beautiful
Reply Share

Gunjan G Traveler · 9w
Nice post, beautiful pictures.
Reply Share Edited

সুচিপত্র

মহাবলিপুরম

রুচিস্মিতা ঘোষের ক্যামেরায়



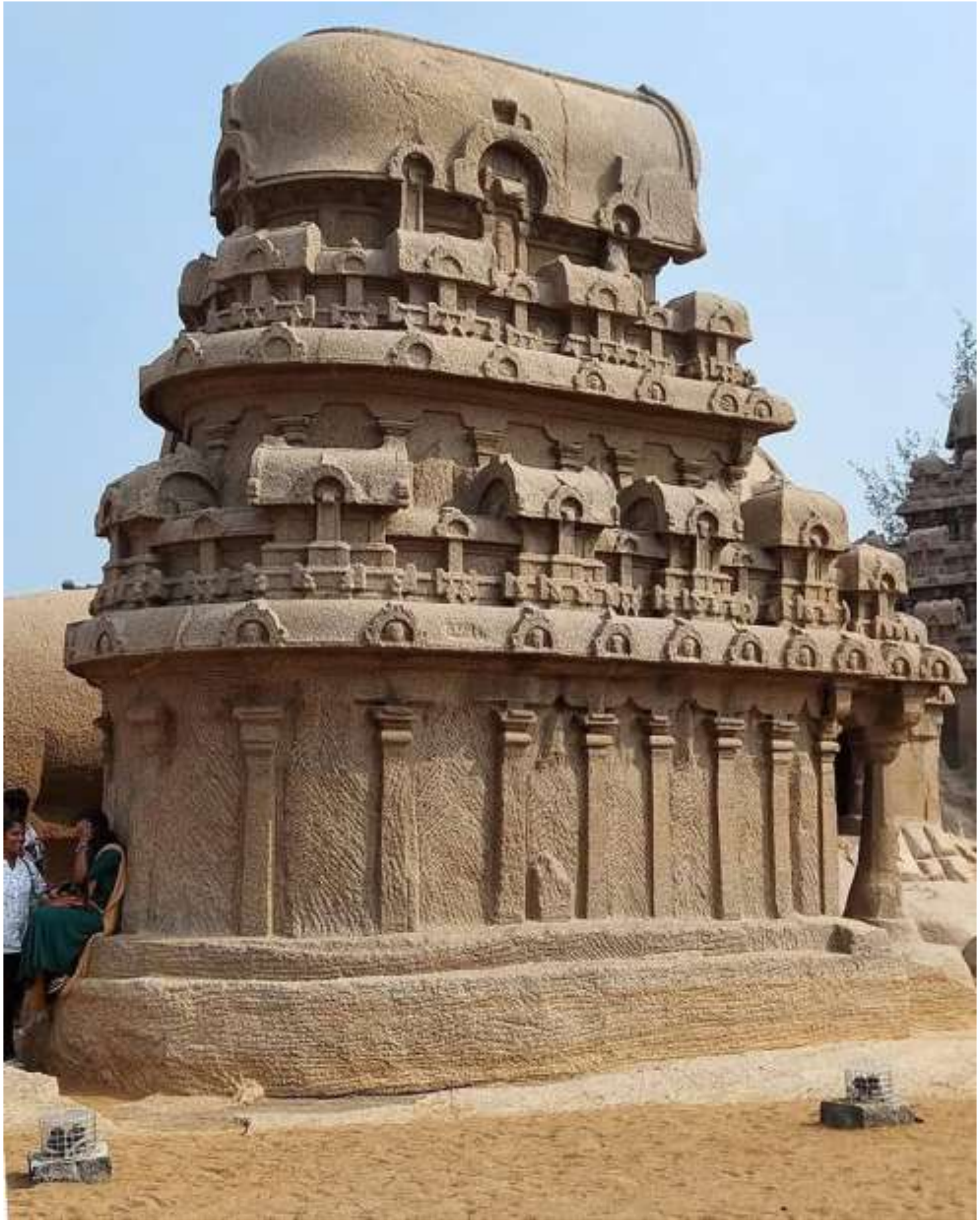
Ghosh Ruchismita

Shore mandir and Pancharatha of Pandava
মহাবলিপুরম (Sculpture)









Selected Comments

Gunjan G Traveler · 7w
সাউথ ইন্ডিয়া ট্যুর এ গেছিলাম। তখন তুই যেতে পারিস নি।

Reply Share

Ghosh Ruchismita · 7w
Gunjan G Traveler পন্ডিচেরী যখন গিয়েছিলাম, সেই যাত্রায়।

Reply Share

সুচিপত্র

Pondicherry

অনন্যা ব্যানার্জির ক্যামেরায়



Ananya Banerjee

Pondicherry

Old Lighthouse during the day and night









Selected Comments



সুচিপত্র

Sarbamangala Ghat, Cossipore



Ananya Banerjee

অনন্যা ব্যানার্জির ক্যামেরায়

Sarbamangala Ghat, Cossipore.

This is named after Goddess Sarbamangala whose temple is located at a stone's throw distance from the Ghat.This is one of Kolkata's least visited ghats. Only locals come here to bathe and perform rites and rituals. As you go down the steps on the right stands an ancient Jagannath Temple. According to the priest, the temple is around 200 years old. It has shrines dedicated to other deities as well. Facing the deities of Lord Jagannath, Sri Baladev and Subhadra Maharani, sits on a small stand a stone image of the Garuda. One can come and enjoy the sunset.










5:55:34





চরৈবেতি চরৈবেতি ফেসবুক গ্রুপ।



Selected Comments



সুচিপত্র

বিষ্ণুপুর

স্বচ্ছশীলা বসুর ক্যামেরায়



Swachchhasila Basu

বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে অনেকেই জানেন, নতুন করে বলার হয়তো কিছু নেই। কিন্তু যারা দুর্গাপূজার সময় যাননি, তারা হয়তো জানেন না, দুর্গাপূজা শুরু হয় কামান দেগে, এবং বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য -- সন্ধি পূজার সময় একটা কামান দাগা হয় যেটা বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীতে রাখা থাকে। অষ্টমীর দিন তাকে রাজবাড়ির বাইরে পাশেই মাছোর পাহাড়, সেই টিলার উপরে নিয়ে আসা হয়। ঠিক সন্ধি মুহূর্তে ওই কামান দাগা হয়। তার পর সারা বিষ্ণুপুরে সবার সন্ধি পূজা শুরু হয়।

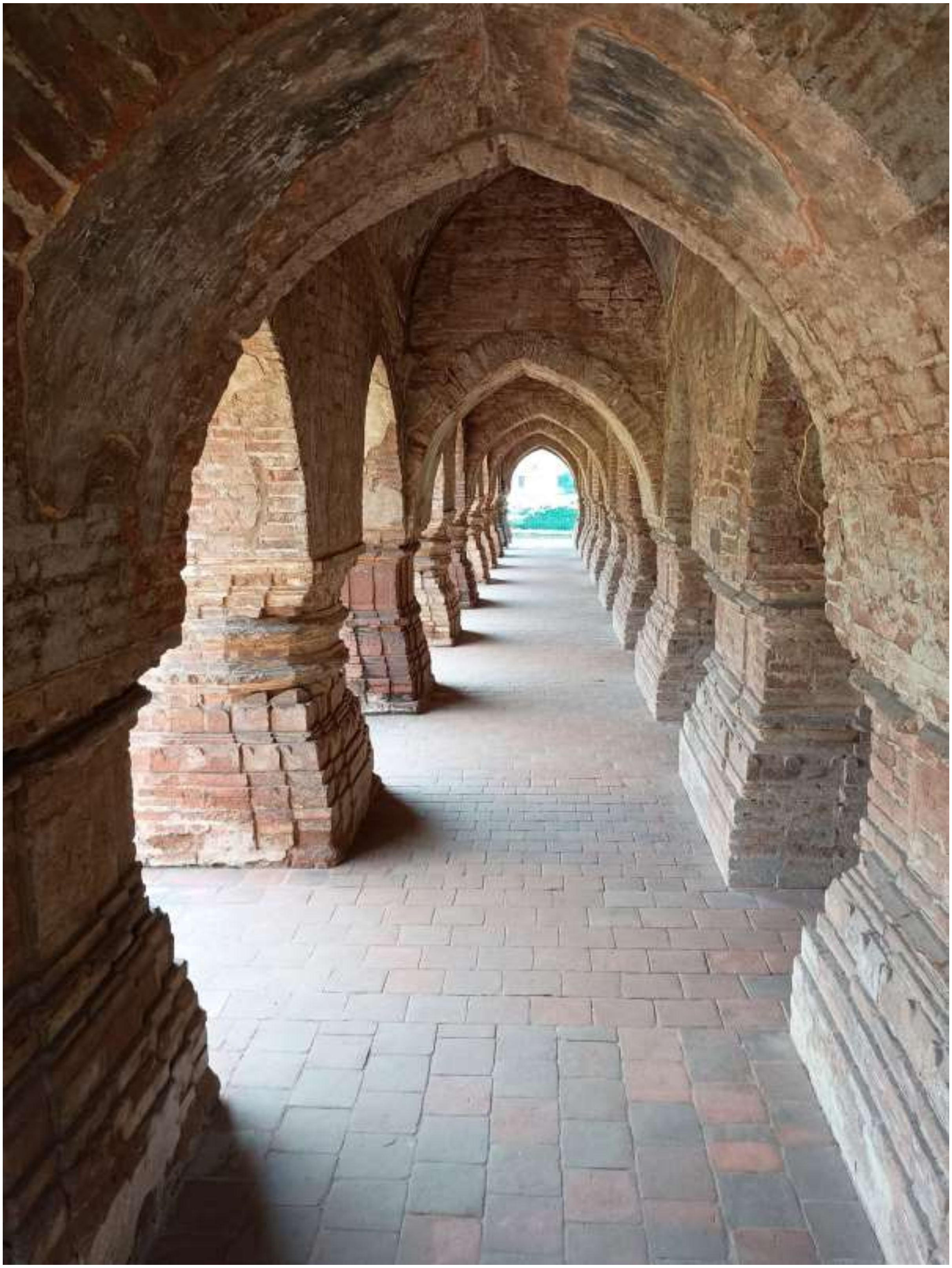
তাছাড়া রাসমঞ্চ এবং মল্ল রাজাদের বানানো অন্যান্য টেরাকোটার মন্দির গুলোর কথা, দলমাদল কামান, পাশেই ছিন্নমস্তার মন্দির ইত্যাদির কথা সবাই জানে।

বিষ্ণুপুরের লাগোয়া জয়পুর জঙ্গল। তার মাঝে একটা বিরাট জায়গা কংক্রিটে বাধানো রয়েছে। সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটা British air strip। এখন ভগ্নাংশ রয়েছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে রীতিমতো গায়ে কাঁটা দেয় ।

Rashmancha



Rashmancha



Madanmohan Mandir



Dalmadal Kaman




মদনমোহন মন্দির
(অক্ষাংশ ২৩°০৪'৫০" উত্তরঃ দ্রাঘিমাংশ ৮৭°১৯'২৪" পূর্ব)
मदनमोहन मंदिर
(अक्षांश 23°04'50" उत्तर, और देशांतर 87°19'24" पूर्व)
MADAN MOHAN TEMPLE
(LAT.23°04'50"N LONG. 87°19',24"E)
THIS BRICK BUILT TEMPLE ON A LARGE LATERITE PLINTH WAS ERECTED TO ENSHRINE THE TUTELARY DEITY OF THE MALLAS. THE TEMPLE IS MUCH CELEBRATED FOR THE ORNAMENTATION WORKS MAINLY ON TERRACOTTA PLAQUES WHICH EMBELLISH ITS WALL. THE TEMPLE HAS COVERED PORCH WITH TRIPLE-ARCHED OPENINGS ON THE EAST, SOUTH AND WEST AND HAS A SINGLE TOWER ON A SLOPING ROOF. THE FACADE OF THE TEMPLE HAS SCENES SHOWING KRISHNALILA EPISODES, SCENES SHOWING DANCERS AND DANCING PARTY AND A ROW OF ASCETICS. ON THE OTHER THREE SIDES, THE ARCHES ARE FITTED WITH PLAQUES CONTAINING FIGURES ENCLOSED BY VERY RICH FLORAL ORNAMENTATIONS. THE AREA RESTING UPON THE ARCHES ARE FOUND COVERED WITH SCENES DEPICTING WAR WHILE THE LOWER PANELS ARE FOUND DECORATED WITH FIGURES OF ANIMALS AND BIRDS, KRISHNALILA, DASAVATARA SCENES, LEGENDS AND STORIES FROM THE PURANAS. THE TEMPLE WAS BUILT BY DURJANA SINGHA IN 1694 CE AS PER INSCRIPTIONAL EVIDENCE.
THE TEMPLE WAS DECLARED AS A MONUMENT OF NATIONAL IMPORTANCE VIDE BG, 4063, DATED 18.8.1913.

Ma Chhinnamasta



WWII British airstrip



Selected Comments

Chandra Sekhar Dey · 8w
বিষ্ণুপুর টেরাকাটার এক প্রসিদ্ধ স্হান। ছবি গুলো সুন্দর । ধন্যবাদ জানাই ।
Reply Share

Gunjan G Traveler · 9w · Admin Top contributor
তথ্য সমৃদ্ধ পোস্ট।
Reply Share

সুচিপত্র

নুব্রা

চন্দ্রশেখর দে'র ক্যামেরায়



Chandrasekhar Dey

ব্যাকট্রিয়ান উট, যা মঙ্গোলিয়ান উট, গৃহপালিত দুই-কুঁজওয়ালা উট বা ডাবল-কুঁজওয়ালা উট নামেও পরিচিত, মধ্য এশিয়ার স্তেপ অঞ্চলের একটি স্থানীয় উট। এক-কুঁজওয়ালা ড্রোমেডারির বিপরীতে এর পিঠে দুটি কুঁজ থাকে। এর প্রায় ২০ লক্ষ জনসংখ্যা প্রধানত গৃহপালিত রূপেই বিদ্যমান। "ব্যাকট্রিয়ান" নামটি এসেছে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ঐতিহাসিক অঞ্চল ব্যাকট্রিয়া থেকে।

শত শত বছর আগে মঙ্গোলিয়ান দের সাথে চলে আসা ডবল কুঁজের উট গুলি আর ফিরে না গিয়ে নুব্রা ভালি তেই বংশানুক্রমিক ভাবে থেকে যায়। এখানে উটের পিঠে উঠে বসলাম আমরা ছজন। ১২০০০ ফিট উচ্চতার মরুভূমিতে যেখানে ছ'মাস বরফের নীচে থাকে ।

প্রাচীনকাল থেকেই গৃহপালিত ব্যাকট্রিয়ান উট মধ্য এশিয়ায় ভারবাহী প্রাণী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রচণ্ড শীত, খরা এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের কঠিন পরিবেশেও সহজে চলাচল করতে পারার অসাধারণ ক্ষমতার কারণে তারা সিল্ক রোড-এর বাণিজ্য কাফেলাগুলোর অন্যতম প্রধান বাহন ছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গৃহপালিত বা বন্য অবস্থায় (feral) থাকা ব্যাকট্রিয়ান উট এবং প্রকৃত বন্য ব্যাকট্রিয়ান উট (Camelus ferus) দুটি পৃথক প্রজাতি। Camelus ferus বর্তমানে পুরাতন বিশ্বের (Old World) একমাত্র প্রকৃত বন্য উটজাতীয় প্রাণী। গবেষণায় জানা যায়, গৃহপালিত ব্যাকট্রিয়ান উট প্রকৃত বন্য ব্যাকট্রিয়ান উটের সরাসরি বংশধর নয়; প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে এই দুটি প্রজাতির বিবর্তনগত বিচ্ছেদ ঘটে।














Welcome



Selected Comments

Gunjan G Traveler · 1w
Nice informatin , wonderful pictures
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 1w
Gunjan G Traveler Thank you
Reply Share

Ghosh Ruchismita · 1w
লাদাখ যখন গিয়েছিলাম, তখন দুই কুঁজ এর উট দেখেছিলাম। আমার লাদাখ নিয়ে লেখাটিতে এর বিশদ বিবরণ আছে।
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 1w
Ghosh Ruchismita তখন পড়া হয়নি দিদি। যদি সুযোগ পাই তো পড়ার ইচ্ছা থাকলো 🙏
Reply Share

সুচিপত্র

প্যাংগং হ্রদ

চন্দ্রশেখর দে'র ক্যামেরায়



Chandrasekhar Dey

প্যাংগং হ্রদ (Pangong Tso) হলো লাদাখ ও তিব্বতের মাঝে অবস্থিত একটি বিখ্যাত লবণাক্ত জলের হ্রদ এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,২২৫ থেকে ৪,৩৫০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এবং এর দৈর্ঘ্য ১৩৪ কিলোমিটার। প্রায় ৪০% ভারতে এবং ৬০% চীনে অবস্থিত। জলের রঙ নীল, সবুজ ও সোনালী রঙে পরিবর্তিত হয় । শীতকালে জল সম্পূর্ণ জমে বরফ হয়ে যায়। বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা 'থ্রি ইডিয়টস'- ও জব তক হ্যায় জান এর শুটিং এখানে হয়েছিল । পরিযায়ী পাখির কলকাকলি দেখা যায়।

এই লেক দুটি দেশের সীমান্ত নিয়ন্ত্রন করেছে। নীল জলে যে আকাশের প্রতিচ্ছবি তা উপরের ফটো দেখেই বোঝা যাচ্ছে । সকালে যখন আকাশে নীল রঙ আসেনি তখন জল কিন্তু নীল নয়। তবে জল পুরোপুরি লবনাক্ত নয়। হালকা নোনতা স্বাদ। গাংচিল আমার ছবিতেই দেখা গেছে। অন্যান্য ছোট পাখিও আছে কিন্তু মাছ একটাও দেখা যায়নি। লেকে নামা বা স্নান করা নিষিদ্ধ। রাতের আকাশ । থাকার জন্য অনেক কটেজ ও তাঁবু আছে কিন্তু বিদ্যুৎ ও মিস্টি জলের সরবরাহ সীমিত। রাত্রি ও দিনের তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। চারিদিকের পাহাড়ের জমা বরফ দেখতে অসাধারণ ।





















Selected Comments

Susmita Kumkum Bagchi · 1w
Excellent photography
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 1w
Susmita Kumkum Bagchi Thank you 🙏
Reply Share

Ghosh Ruchismita · 1w
Beautiful pictures.
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 1w
Ghosh Ruchismita Thank you madam 🙏
Reply Share

Gunjan G Traveler · 1w
Wonderful pictures with useful information। Thanks।
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 1w
Gunjan G Traveler Thank you 😊
Reply Share

সুচিপত্র

Hemis Monastery

চন্দ্রশেখর দে'র ক্যামেরায়



Chandrasekhar Dey

Hemis Monastery is a Himalayan Buddhist monastery (gompa) of the Drukpa Lineage, in Hemis on the bank of the Indus River, Ladakh. Situated 45 km from Leh, it was re-established in 1672 by the Ladakhi king Sengge Namgyal. The annual Hemis festival honouring Padmasambhava is held there in early June.










HEMIS MUSEUM







Selected Comments

Gunjan G Traveler · 3w
Nice information, nice pictures. Thanks for sharing.
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 3w
Gunjan G Traveler Thank you ❤️
Reply Share

সুচিপত্র

Thang

চন্দ্রশেখর দে'র ক্যামেরায়



Chandrasekhar Dey

Thang, the northernmost and last village in India before the Actual Line of Control (LOC), located just 10 km past Turtuk. It sits just 2.5 km from the border and offers views of Pakistani-controlled posts and the Shyok River.
Seized from Pakistan during the 1971 Indo-Pakistani War. While tourists can freely explore Turtuk, officially entering Thang requires carrying valid identity proofs and making copies of your Nubra/Turtuk Inner Line Permit.Border Viewpoint: Most visitors are directed to an army bunker viewpoint overlooking the border, though some travelers manage to visit the village headman's house.









Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 4w
Very nice.
Reply Share

Gunjan G Traveler · 4w · Admin
nice post with nice pictures.
Reply Share

সুচিপত্র

Turtuk

চন্দ্রশেখর দে'র ক্যামেরায়



Chandrasekhar Dey

Turtuk

Turtuk is the northernmost and one of the last inhabited frontier villages in India, situated in the Nubra Valley of Ladakh along the Shyok River. Located 205 km from Leh at 3,001 meters (9,846 feet), this former Balti village was part of Pakistan until it was captured by the Indian Army in 1971.

The Last Village of India - Turtuk sits right along the Line of Control (LoC). Because it was closed to outsiders until 2010, the settlement has retained a rich, distinct Balti culture, Islamic heritage, and unique vernacular architecture. The village is split into two halves—Yul and Farool—connected by a historic wooden suspension bridge.

























Selected Comments



সুচিপত্র

Lamayuru - Sangam - Magnetic Hill - Gurudwara Pathar Sahib



Chandrasekhar Dey

চন্দ্রশেখর দে'র ক্যামেরায়

Lamayuru (Moonland) - A village famous for its mesmerizing, surreal geographical rock formations that closely resemble the surface of the moon.



Lamayuru (Moonland) - A village famous for its mesmerizing, surreal geographical rock formations that closely resemble the surface of the moon.



Sangam (Confluence) - The spectacular meeting point of the muddy Indus River and the clearer, turquoise Zanskar River near Nimmu.



Magnetic Hill Terrain - A famous gravitational anomaly stretch where vehicles appear to roll uphill against gravity when left in neutral.



Gurudwara Pathar Sahib - A historic Sikh shrine constructed and maintained beautifully by the Indian Army.







Selected Comments



সুচিপত্র

Doodhpathri

চন্দ্রশেখর দে'র ক্যামেরায়



Chandrasekhar Dey

Doodhpathri is a breathtaking, offbeat hill station and meadow located in the Budgam district of Jammu and Kashmir, about 42 km southwest of Srinagar. Sitting at an altitude of 2,730 meters (8,960 ft), it is known as the "Valley of Milk" due to the foaming, white waters of the Shaliganga River running through it.









Selected Comments

Ghosh Ruchismita · 5w
Beautiful.
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 5w
Ghosh Ruchismita Thank you didi 🙏
Reply Share

Gunjan G Traveler · 5w
আমাদের কাশ্মীর যাত্রার কথা মনে পড়ছে।
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 5w
Gunjan G Traveler বার বার ২০১৬ র কাশ্মীর এর সঙ্গে মিল খোঁজার চেষ্টা করছি। ওটা ছিল অভুতপুর্ব ।এবারে কাশ্মীর এর সাথে লে-লাদাখ
Reply Share Edited

Susmita Kumkum Bagchi · 5w
অপূর্ব
Reply Share

Chandra Sekhar Dey · 5w
Susmita Kumkum Bagchi ধন্যবাদ 🙏
Reply Share

সুচিপত্র

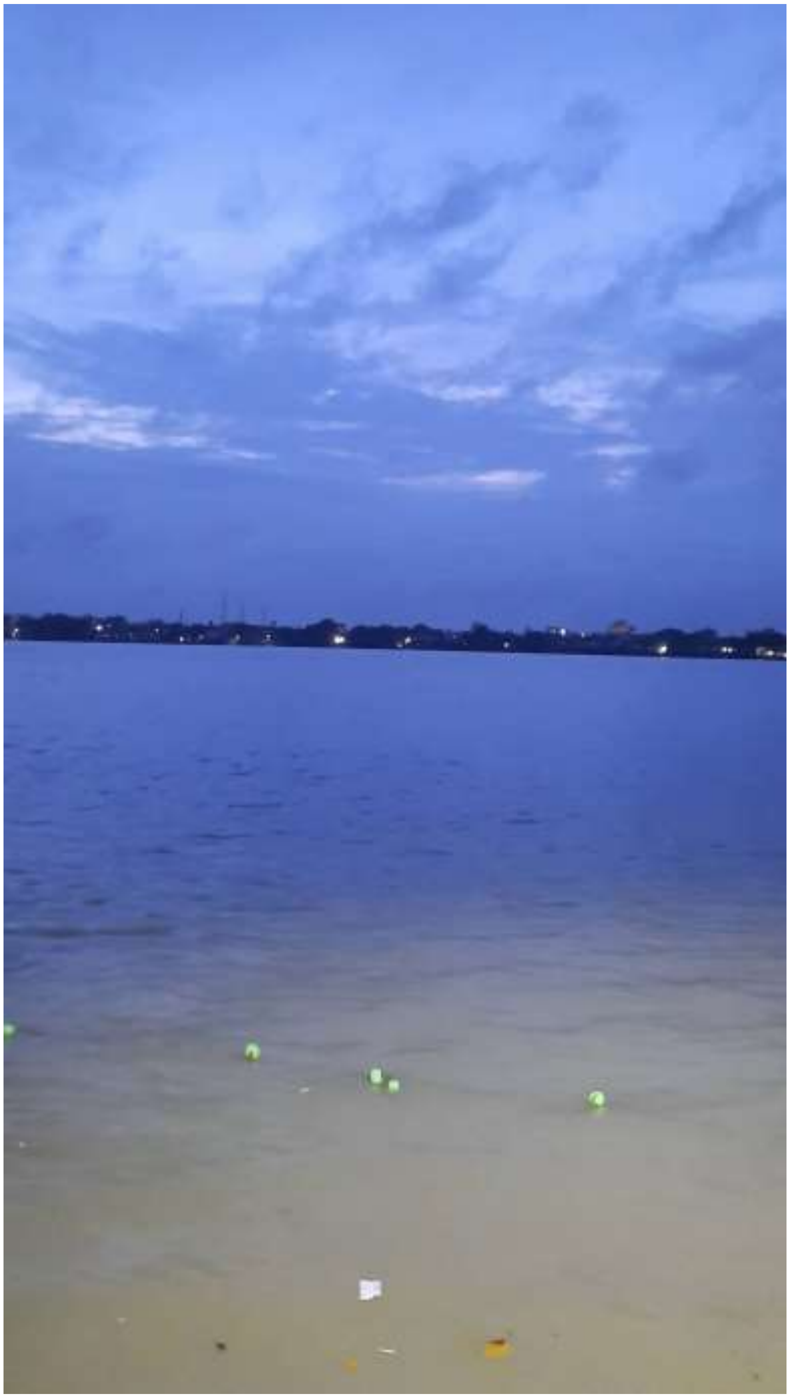
BLUE SKY
GANGA RIVER
সুদীপ্ত দত্তের ক্যামেরায় :



Dutta Sudipta







Selected Comments

Gunjan G Traveler · 1w
Nice pictures
Reply Share

সুচিপত্র

সুন্দরী অরুণাচল। তীর্থঙ্কর প্রামানিকের ক্যামেরায়



Tirthankar Pramanick











Selected Comments

Chandra Sekhar Dey · 8w
অসাধারণ 👏
Reply Share

Debparna Saha · 9w
Khub sundor
Reply Share

Gunjan G Traveler · 9w
দারুন সুন্দর
Reply Share

Ghosh Ruchismita · 9w
খুব সুন্দর।
Reply Share

সুচিপত্র

Tippi Orchid Center, Arunachal



Tirthankar Pramanick

তীর্থঙ্কর প্রামানিক








Wedding Orchid
(Dendrobiums)



Selected Comments



সুচিপত্র